ভ্লাদিমির বগমোলভ

নাম ছিল তার ইভান

ভ্লাদিমির বগমোলভ

নাম ছিল তার

উপাখ্যান

ছবি এঁকেছেন
ওরেস্ত ভেরেইস্কি

‘রাদুগা’ প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Владимир Богомолов
ИВАН
Повесть
На языке бенгали

V. Bogomolov
IVAN
A Story
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001225-2

যুদ্ধ ও শিশু

এমন অনেক জাতি আছে যারা অনেক অনেক বছর হল যুদ্ধ কাকে বলে জানে না। তাদের শহরের ওপর বোমারু বিমান হানা দেয় নি, ট্যাঙ্কের ক্যাটারপিলার তাদের খেতের শস্য মাড়ায় নি। নীরব ডাকপিওনকে নিকট আত্মীয়স্বজন নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দরজায় ঘা দিয়ে বেড়াতে হয় নি। সেই সব জাতি যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে বই পড়ে, সিনেমা দেখে, বৃদ্ধদের মুখে গল্প শুনে।

যুদ্ধ যারা জানে না, এ বই পড়ে তারা অবাক হতে পারে। একটা সাধারণ ছেলে, যার ছোটা উচিত স্কুলে, যার উচিত পড়াশুনা করা, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করা — সে কিনা যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে পড়ে গেল, সৈনিকের মৃত্যু বরণ করল! — এ ঘটনা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু এই বইয়ের নায়ক সম্পর্কে, খাঁটি রুশী নামধারী একটি ছেলে ইভান সম্পর্কে তোমরা যা যা জানতে পারবে সে সবই সত্যি।

আমি বলব তার চেয়েও বেশি। এই কাহিনী এক বিরাট নিষ্ঠুর সত্যের একটি অংশ, যাকে বলে যুদ্ধে শিশুদের ভূমিকা, সেই আশ্চর্য বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের একটি পাতা।

সকলে জানে যে যুদ্ধ পুরুষের কাজ, বয়স্ক লোকদেরই তা সাজে। হয়ত কোন এক কালে সুদূর অতীতে তা-ই ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী ও দখলদারদের যুদ্ধ ক্ষমাহীন। এই যুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা কাউকে রেহাই দেয় না। এ সমস্ত যুদ্ধে দখলদাররা নিছক সৈন্য নয়, তারা খুনে সৈন্য।

ঠিক এই রকমই এক যুদ্ধ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফাশিস্ত জার্মানির যুদ্ধ — মানুষের ইতিহাসে চরম নৃশংস, চরম বিধ্বংসী সে যুদ্ধ।

২১ জুন গভীর রাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্রেস্ত্ স্টেশন থেকে জার্মানির উদ্দেশ্যে ছাড়ল মালগাড়ি। মালগাড়ির ওয়াগনগুলোর গায়ে খড়িমাটি দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা ছিল সংক্ষিপ্ত, দরদভরা একটি কথা — শস্য। আমরা পশ্চিমে পাঠাচ্ছিলাম শস্য, আমাদের কাম্য ছিল শান্তি।

কিন্তু এর দু'ঘণ্টা বাদে, শস্য নিয়ে যেখানে ট্রেন রওনা দিয়েছে, ওধার থেকে ১৯৪১ সালের ২২ জুন প্রত্যুষে আমাদের ওপর এসে পড়ল ইস্পাত আর আগুনের লাভাস্রোত। ফাশিস্তদের লৌহকঠিন দঙ্গলও পথে যা যা পড়ল ধ্বংস করতে করতে সীমানা পেরিয়ে চলল। বাড়িঘর ধ্বংস হল, খেতের ফসল আগুনে পুড়ল। সৈন্যদের পাশাপাশি শিশুরাও নিহত হতে লাগল।

শিশুদের রক্ষা করার জন্য, যুদ্ধের অগ্নিস্রোত যেখানে

পৌঁছুতে পারে না সেরকম কোন দূরত্বে, ফ্রন্টলাইনের গভীর পশ্চাদ্ভাগে তাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য আমাদের লোকেরা অবিশ্বাস্য রকমের প্রয়াস চালাল। সর্বপ্রথম স্থানান্তরিত করা হতে লাগল শিশুদের, তাদের জন্য গাড়ি ও এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু বয়স্করা সব শিশুকে রক্ষা করতে পারেন নি।

আমার মনে পড়ে ব্রেস্তের কাছাকাছি জায়গায় বনের ভেতরে একটা ছোট্ট নিঃসঙ্গ কবর। একটা খুঁটির গায়ে তক্তা মেরে তার ওপর লেখা আছে: 'এখানে তানিয়া চিরনিদ্রায় শায়িত'। কে এই তানিয়া? কী করে সে ফাশিস্তদের শিকার হল? আমাদের এই বইয়ের নায়ক ইভানের মতো সেও কি একজন খুদে যোদ্ধা ছিল, নাকি ফাশিস্তরা তাকে মেরে ফেলে স্রেফ এই কারণে যে সে বেঁচে ছিল, তার জন্মস্থান এই ধরিত্রীর বুকে ঘুরে বেড়াত, সূর্যকে দেখে আনন্দ পেত?

বহু সোভিয়েত ছেলেমেয়ে শত্রুব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে থেকে বয়স্কদের সঙ্গে মিলে সংগ্রাম করে।

শান্তির সময়তেই তারা পোড় খেয়ে পোক্ত হয়ে উঠছিল। তারা জানত কাকে বলে মাইলের পর মাইল কঠিন পথযাত্রা, কাকে বলে ক্যাম্প ফায়ারের সামনে রাত কাটানো, তারা সহিষ্ণু হতে শেখে, লক্ষ্যভেদী গুলি ছুড়তে, ব্যান্ডেজ বাঁধতে শেখে।

তাদের শিখিয়েছিলেন বয়স্করা, যাঁদের মনে ছিল নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্য তাঁদের সংগ্রামের স্মৃতি। তাদের শেখায় স্কুল, শেখায় বইপুথি।

সোভিয়েত শিশুদের প্রিয় লেখক আর্কাদি গাইদার কী বলে যুদ্ধের মুখোমুখি হন শোন: 'আমি মরণকে পরোয়া করি না। আমাকে বন্দুক দাও, আমি সঙ্গীন আর গুলি নিয়ে যাব মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে।'

এই শিক্ষা আমাদের শিশুদের কাজে লাগে।

যুদ্ধে শিশুদেরও ভূমিকা ছিল। তারা বয়স্কদের বোঝা হয়ে থাকে নি, যদিও কঠিনতম মুহূর্তেও সোভিয়েত লোকেরা শিশুদের দুঃখদুর্দশা হালকা করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। শিশুদের মধ্য থেকে বেশ কিছু দৃঢ়চেতা, নির্ভীক যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটে।

যুদ্ধের শেষ তোপধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর আরও অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু লোকে এখনও ভলোদিয়া দুবিনিন, গুলিয়া করলিওভা বা জোইয়া কস্‌মদেমিয়ান্‌স্কায়ার মতো যোদ্ধাদের কথা ভোলে নি।

এই সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের প্রথম সারির একজন ছিল জোইয়া কস্‌মদেমিয়ান্‌স্কায়া। তার বয়স তখন ছিল আঠারো। স্কাউটিং-এর কাজ করতে গিয়ে সে ফাশিস্তদের হাতে পড়ে। সংযতবাক কোমল এই মেয়েটির প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও শৌর্য ফাশিস্তদের বিস্ময় উদ্রেক করে। জেরার সময় সে নির্বাক থাকে, তার ওপরে নির্যাতন চলা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গীদের ধরিয়ে দেয় নি। তারপর তার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে তাকে যখন খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখনও সে ক্ষমা প্রার্থনা করল না, মৃত্যুকে সে এমন নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করল যে তার নাম পরিণত হল কিংবদন্তীতে। তার নাম বীরত্বপূর্ণ কীর্তিসাধনের পথে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়, শত্রুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করে।

ভলোদিয়া দুবিনিন যুদ্ধের আগে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। যুদ্ধের সময় মাটির তলার গুহা প্রকোষ্ঠে গেরিলাদের একটি বাহিনী শত্রুর কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকে। ভলোদিয়া হল সেই বাহিনীর একজন স্কাউট। ছেলেটি ছিল নির্ভীক,

চটপটে, সে এমন সমস্ত ফাঁকফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ত যেখানে ঢোকা কোন বয়স্ক লোকের সাধ্য হত না। গণ প্রতিহিংসা বাহিনীকে সে বিপুল সাহায্য করে। সেও নিহত হয় — বীরের মহান মৃত্যু বরণ করে।

যুদ্ধে শিশুদের ভূমিকা সম্পর্কে আরও কথা। সব শিশুই যে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এমন নয়। অনেকে যার যতদূর সাধ্য সেই অনুযায়ী বয়স্কদের সাহায্য করেছে।

আমার মনে আছে লেনিনগ্রাদে ছেলেমেয়েদের নিজেদের হাতে গড়া একটা ছোট্ট মিউজিয়মে আমি স্কুলের এক ছাত্রীর নম্বরের একটা খাতা দেখেছিলাম। সেখানে কেবল ভালো আর উৎকৃষ্ট মানের নম্বর। এরকম নম্বরের খাতা এখন লক্ষ লক্ষ — সেগুলো ত আর মিউজিয়মে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয় না! কিন্তু ঐ খাতাটা ছিল একটা ছোট মেয়ের যে ১৯৪১-১৯৪২ সালের শীতকালে লেনিনগ্রাদে বসে পড়াশুনা করেছিল। শহর তখন জ্বলছে, শহরের লোকজন ক্ষুধার তাড়নায়, শীতের কামড়ে মারা যাচ্ছে, অবিরাম বোমা আর গুলিগোলাবর্ষণ তখন শহরের অভ্যস্ত দৃশ্য, শহর শত্রুপক্ষের অবরোধের লৌহবেষ্টনীতে বাঁধা। এই রকম যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ছোট মেয়েটি করে গেছে তার অভ্যস্ত কাজ— সে পড়াশুনা করেছে, শুধু তা-ই নয় ভালো নম্বর পেয়ে পড়াশুনা করেছে। এখানেই তার শৌর্য, তার চরিত্রের দৃঢ়তা, আর এই দিয়েই সে প্রতিহত করেছে শত্রুকে, এইভাবেই সে সংগ্রাম করেছে।

যুদ্ধে শিশুদের ভূমিকা সম্পর্কে আমি আরও অনেক কথা বলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয় এই বইয়ে যে কাহিনীটি তোমরা পড়বে তার মধ্যে তোমরা তোমাদের সমবয়সী এমন এক ছেলের কীর্তির অকপট, সত্য ও ভয়ঙ্কর বিবরণ পাবে, যে

আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে। আর সে প্রাণ বলি দিয়েছে বলেই না নিজের রক্তবন্যার মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে ফ্যাসিবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, তোমার কাছে, আগামী দিনের শিশুদের কাছে আসতে-আসতেও আসতে পারে নি।

খুদে পাঠক, লোকজনের কাছ থেকে আড়ালে, একা একা পড়ার জন্য তোমাদের হাতে আমি তুলে দিচ্ছি চিন্তাভাবনার উপযোগী এই কঠিন বই। মনোযোগ দিয়ে এ বই পড়ো, ছোট্ট রুশী ছেলে ইভানের কাছ থেকে শেখো শৌর্য, সাহসিকতা, আর সবচেয়ে বড় কথা — দেশপ্রেম।

ইউরি ইয়াকভ্‌লেভ

এক

সেদিন রাতে আমি ঠিক করলাম ভোরের আলো ফোটার আগে যুদ্ধের আউটপোস্টগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখব। তাই কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় আমাকে জাগিয়ে দিতে বলে আটটার কিছু পরে আমি ঘুমোতে গেলাম।

ডাকাডাকিতে কিন্তু আরও আগে আমার ঘুম ভেঙে গেল — জ্বলজ্বলে ডায়ালের গায়ে ঘড়ির কাঁটাদুটো দেখে বুঝলাম একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

'কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট, কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট, শুনছেন...' কে যেন জোরে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। টেবিলের ওপর মিটমিট করে যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল তার আলোয়

ঠাহর করে আমি দেখতে পেলাম আউটপোস্ট প্লেটুনের ল্যান্স কর্পোরাল ভাসিলিয়েভকে। সে বলল, 'এখানে একজনকে আমরা আটকেছি। জুনিয়ার লেফটেনান্ট বললেন আপনার কাছে নিয়ে আসতে।'

'বাতিটা জ্বালান!' আমি হুকুম দিলাম। মনে মনে গালাগাল দিলাম — আমাকে না জ্বালিয়ে যেন আর ফয়সালা করতে পারত না!

ভাসিলিয়েভ বাতির সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে জানাল:

'পাড়ের কাছাকাছি জলের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছিল। কেন, তা বলে না — কেবল বলছে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। প্রশ্ন করলে কোন জবাব দেয় না, বলে বলব শুধু কম্যান্ডিং অফিসারের কাছে। দেখে মনে হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু বলা যায় না — হয়ত ভান করছে। জুনিয়র লেফটেনান্ট হুকুম দিলেন...'

আমি কম্বলের নীচ থেকে পা বাড়িয়ে দিয়ে ধড়মড় করে বাঙ্কের ওপরে উঠে বসলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কটাচুল নওজোয়ান ভাসিলিয়েভ। তার গায়ের হাতা-ছাড়া বর্ষাতিটা জলে কালো ও সপসপে হয়ে উঠেছে, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

বাতির সলতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে ট্রেঞ্চের ভেতরকার প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-ঘরটাকে আলোকিত করে তুলল। দরজার ঠিক পাশে আমি দেখতে পেলাম একটা রোগা বাচ্চা ছেলেকে। বয়স তার বছর এগারো, ঠান্ডায় সারা শরীর নীল হয়ে গেছে, হি-হি করে কাঁপছে। পরনের শার্ট আর প্যান্ট ভিজে গায়ে লেপ্টে গেছে;

ছোট ছোট খালি পা দুটো হাঁটু অবধি কাদা মাখা। তাকে দেখে আমারই কাঁপুনি এসে গেল।

আমি তাকে বললাম, 'যাও, চুল্লীর ধারে গিয়ে দাঁড়াও। ...কে তুমি?'

সে এগিয়ে এলো। তার দু'চোখের মাঝখানের ফাঁকটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। সে তার ডাগর চোখের সতর্ক দৃষ্টি মেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তার চোয়ালের হাড় উঁচু, জলকাদা যেন তার চামড়ার ভেতর পর্যন্ত বসে গিয়ে তার মুখে গাঢ় ছাই-ছাই রঙ লেপে দিয়েছে। ভিজে চুল গোছা-গোছা হয়ে ঝুলছে, চুলের সঠিক রঙ বোঝার উপায় নেই। তার দৃষ্টির মধ্যে, তার শক্ত করে চেপে থাকা নীল ঠোঁটে আর যন্ত্রণাকাতর মুখের ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা ভয়ানক মানসিক উদ্বেগ। আমার মনে হল কেমন যেন একটা অবিশ্বাস ও শত্রুতার ভাবও তার মধ্যে আছে।

'কে তুমি?' আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

'ওকে চলে যেতে বলুন,' চোখের ইশারায় ভাসিলিয়েভকে দেখিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে দুর্বল কণ্ঠে ছেলেটি বলল।

'আরও কিছু কাঠ চুল্লীতে দিয়ে ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করুন,' আমি ভাসিলিয়েভকে হুকুম দিলাম।

সুড়ঙ্গ-ঘরটা বেশ গরম আর আরামের। ভাসিলিয়েভের ইচ্ছে, যতক্ষণ পারা যায় সেখানে থাকে, তাই কোন রকম ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেসুস্থে আধপোড়া কাঠের টুকরোগুলো ঠিকঠাক করে দিল, ছোট ছোট লাকড়ি চুল্লীর ভেতরে ঠাসল, তারপর ঐ রকমই ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গেল।

ঠাহর করে আমি দেখতে পেলাম আউটপোস্ট প্লেটুনের ল্যান্স কর্পরাল ভাসিলিয়েভকে। সে বলল, 'এখানে একজনকে আমরা আটকেছি। জুনিয়ার লেফটেনাণ্ট বললেন আপনার কাছে নিয়ে আসতে।'

'বাতিটা জ্বালান!' আমি হুকুম দিলাম। মনে মনে গালাগাল দিলাম — আমাকে না জ্বালিয়ে যেন আর ফয়সালা করতে পারত না!

ভাসিলিয়েভ বাতির সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে জানাল:

'পাড়ের কাছাকাছি জলের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছিল। কেন, তা বলে না — কেবল বলছে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। প্রশ্ন করলে কোন জবাব দেয় না, বলে বলব শুধু কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে। দেখে মনে হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু বলা যায় না — হয়ত ভান করছে। জুনিয়র লেফটেনাণ্ট হুকুম দিলেন...'

আমি কম্বলের নীচ থেকে পা বাড়িয়ে দিয়ে ধড়মড় করে বাঙ্কের ওপরে উঠে বসলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কটাচুল নওজোয়ান ভাসিলিয়েভ। তার গায়ের হাতা-ছাড়া বর্ষাতিটা জলে কালো ও সপসপে হয়ে উঠেছে, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

বাতির সলতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে ট্রেঞ্চের ভেতরকার প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-ঘরটাকে আলোকিত করে তুলল। দরজার ঠিক পাশে আমি দেখতে পেলাম একটা রোগা বাচ্চা ছেলেকে। বয়স তার বছর এগারো, ঠাণ্ডায় সারা শরীর নীল হয়ে গেছে, হি-হি করে কাঁপছে। পরনের শার্ট আর প্যাণ্ট ভিজে গায়ে লেপ্‌টে গেছে;

ছোট ছোট খালি পাদ্দটো হাঁটু অবধি কাদা মাখা। তাকে দেখে আমারই কাঁপ্দনি এসে গেল।

আমি তাকে বললাম, 'যাও, চুল্লীর ধারে গিয়ে দাঁড়াও। ...কে তুমি?'

সে এগিয়ে এলো। তার দ্দ'চোখের মাঝখানের ফাঁকটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। সে তার ডাগর চোখের সতর্ক দ্ৃষ্টি মেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তার চোয়ালের হাড় উঁচু, জলকাদা যেন তার চামড়ার ভেতর পর্যন্ত বসে গিয়ে তার ম্দখে গাঢ় ছাই-ছাই রঙ লেপে দিয়েছে। ভিজে চুল গোছা-গোছা হয়ে ঝুলছে, চুলের সঠিক রঙ বোঝার উপায় নেই। তার দ্ৃষ্টির মধ্যে, তার শক্ত করে চেপে থাকা নীল ঠোঁটে আর যন্ত্রণাকাতর ম্দখের ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা ভয়ানক মানসিক উদ্বেগ। আমার মনে হল কেমন যেন একটা অবিশ্বাস ও শত্র্দতার ভাবও তার মধ্যে আছে।

'কে তুমি?' আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

'ওকে চলে যেতে বল্দন,' চোখের ইশারায় ভাসিলিয়েভকে দেখিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে দ্দর্বল কণ্ঠে ছেলেটি বলল।

'আরও কিছ্দ কাঠ চুল্লীতে দিয়ে ওপরে গিয়ে অপেক্ষা কর্দন,' আমি ভাসিলিয়েভকে হ্দকুম দিলাম।

স্দড়ঙ্গ-ঘরটা বেশ গরম আর আরামের। ভাসিলিয়েভের ইচ্ছে, যতক্ষণ পারা যায় সেখানে থাকে, তাই কোন রকম ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেস্দস্থে আধপোড়া কাঠের টুকরোগ্দলো ঠিকঠাক করে দিল, ছোট ছোট লাকড়ি চুল্লীর ভেতরে ঠাসল, তারপর ঐ রকমই ধীরেস্দস্থে বেরিয়ে গেল।

আমি ততক্ষণে পায়ে বুটজুতো গলিয়ে নিয়েছি। উৎসুক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম ছেলেটার দিকে।

'চুপ করে আছ যে বড়? কোথা থেকে আসছ তুমি?'

'আমি বন্দারেভ,' এমন ভঙ্গিতে, মৃদুস্বরে সে কথাগুলো বলল যেন তার নামের বিশেষ কোন অর্থ আছে আমার কাছে, কিংবা মোটের ওপর এই নাম থেকে যেন সব কিছু আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে সে যোগ করল, 'এক্ষুনি হেড কোয়ার্টারে একান্ন নম্বরকে জানান যে আমি এখানে আছি।'

'বটে!' আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। 'আচ্ছা, তারপর?'

'তার পরের ব্যাপার আপনাকে দেখতে হবে না। যা করার ওরা নিজেরাই করবে।'

'সেই 'ওরাটা' কারা শুনি? কোন্ হেড কোয়ার্টারে জানাতে হবে, আর একান্ন নম্বরই বা কে?'

'আর্মির হেড কোয়ার্টারে।'

'আর একান্ন নম্বর? সে কে?'

ছেলেটা উত্তর দিল না।

'কোন্ আর্মির হেড কোয়ার্টার তোমার দরকার?'

'মিলিটারি ডাক ভে-চে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ।'

সে নির্ভুল আমাদের আর্মির হেড কোয়ার্টারের ডাকের নম্বর আউড়ে গেল। আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আমি এবারে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে গোটা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ঊরু অবধি ঝুলে থাকা নোংরা জামা আর তার পরনের খাটো ও সরু প্যান্টটা ছিল পুরনো, গেঁয়ো ধরনে সেলাই করা, মোটা কাপড়ের — আমার যতদূর মনে হল বুঝিবা ঘরে বোনা

কাপড়েরই হবে। কিন্তু কথা সে বলছিল নির্ভুল, কোন রকম গেঁয়ো টান তার মধ্যে ছিল না। তার কথার মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছিল মস্কো বা বেলোরুশিয়ার লোকদের মতো উচ্চারণের ধাঁচ। মোট কথা, উচ্চারণ দেখে বিচার করতে গেলে তার জন্মকর্ম শহরেই বলতে হয়।

তার সর্বাঙ্গ হি-হি করে কাঁপছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুশব্দে নাক টানতে টানতে পাড়িয়ে চলার ভাব বজায় রেখে, সতর্ক দৃষ্টিতে, ভ্রূকুটি করে সে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

'গা থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলে গা-হাত-পা রগড়ে রগড়ে মুছে ফেল। চটপট!' এই বলে আমি তার দিকে ঘিয়ে রঙের যে তোয়ালেটা বাড়িয়ে দিলাম সেটাকে এখন আর অবশ্য তেমন পরিষ্কার বলা চলে না।

সে তার জামাটা টেনে খুলে ফেলতে বেরিয়ে এলো নোংরামাখা কালো, হাড় জিরজিরে রোগা শরীর। তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল।

'ধর, ধর! ওটা নোংরা।'

সে তার বুক, পিঠ, হাত মুছতে শুরু করল।

'প্যান্টও খুলে ফেল!' আমি হুকুম দিলাম। 'কী হল, লজ্জা করছ নাকি?'

এবারেও সে কোন কথা বলল না। বেল্টের বদলে যে দড়ি দিয়ে প্যান্ট বাঁধা ছিল তার গিঁটটা জলে ভিজে ফুলে যাওয়ায় বেশ কষ্ট করে সেটাকে খোলার পর প্যান্ট ছেড়ে ফেলল। দেখা গেল সে নেহাৎই ছেলেমানুষ — তার কাঁধদুটো সরু সরু, ঠ্যাঙ আর হাতও সরু। দেখলে দশ-এগারো বছরের বেশি মনে হয় না, যদিও তার গম্ভীর গোমড়া মুখে যে একাগ্রতার ভাব সেটা আদৌ

বাচ্চাদের মতো নয় এবং তার ঢিবি-কপালের ওপর যেরকম ভাঁজ পড়েছে তাতে তাকে সম্ভবত তেরোর কম বলা চলে না। জামা আর প্যান্টটা তুলে নিয়ে সে দরজার ধারে একটা কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'শুকোবে কে শুনি? — তোমার খুড়োমশাই নাকি?' আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাকে ওরা যা যা দরকার সব এনে দেবে।'

'আচ্ছা!' আমি সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম। 'তাহলে কোথায় তোমার জামাকাপড়?'

সে চুপ করে রইল। আমি ওকে প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ওর পরিচয়পত্র ইত্যাদি কোথায়, কিন্তু সময় মতো আমার খেয়াল হল যে সে এত ছোট যে কোন পরিচয়পত্র তার থাকার কথা নয়।

আমার আর্দালি তখন চিকিৎসার জন্য ব্যাটেলিয়ন এইড পোস্টে ছিল। আমি বাঙ্কের তলা থেকে তার পুরনো তুলোর কোর্তাটা বার করলাম। ছেলেটা আমার দিকে পিছন ফিরে চুল্লীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাঁধের পেছনের উঁচিয়ে থাকা দুই তীক্ষ্ন ফলার মাঝখানে দেখতে পেলাম বড় তামার পয়সার আকারের একটা কালো জড়ুল। ডান কাঁধের ফলার খানিকটা ওপরে একটা লাল দগদগে কাটা দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে — আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ওটা বুলেটের আঘাতের দাগ।

'তোমার পিঠে ওটা কী?'

সে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

'আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার পিঠে ওটা কিসের দাগ?' তুলোর কোর্তাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে গলা চড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ওপর অমন চেঁচাবেন না বলছি!' সে বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলল, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মতো সবুজ চোখে খেলে গেল একটা হিংস্র ঝলক। অবশ্য কোর্তাটা সে নিল। তারপর যোগ করল, 'আপনার কাজ খবর পাঠানো যে আমি এখানে। বাদবাকি ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না!'

'তুমি আমাকে শেখাতে এসো না!' আমি বিরক্ত হয়ে তার ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলাম। 'তুমি কোথায় আছ, কী রকম ব্যবহার করা উচিত সে খেয়াল তোমার নেই। তোমার নাম থেকে কিছুই বোঝার নেই আমার। যতক্ষণ না তুমি বলছ তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, নদীর ধারে তুমি কী করছিলে ততক্ষণ আমি কুটোটি পর্যন্ত নাড়ব না।'

'এর জন্য পরে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে!' সাফ হুমকি দিয়ে সে জানাল।

'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করো না বলছি — তুমি এখনও নেহাৎই ছোট! আমার সঙ্গে তোমার এই মুখ বোজা খেলা দিয়ে কোন কাজ হবে না কিন্তু। ঠিক করে বল, কোথা থেকে আসছ?'

তুলোর কোর্তাটা সে ততক্ষণে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে — ওটা প্রায় তার হাঁটু অবধি নেমে এসেছে। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে এক পাশে মুখ সরিয়ে নিল।

'তুমি এখানে সারা দিন বসে থাকবে — তিন দিন, পাঁচ দিনও তোমাকে বসে থাকতে হতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না বলছ তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, ততক্ষণ তোমার কোন খবর আমি কোথাও পাঠাচ্ছি না!' আমি ওকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলাম।

উদাসীন, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, কোন কথা বলল না।
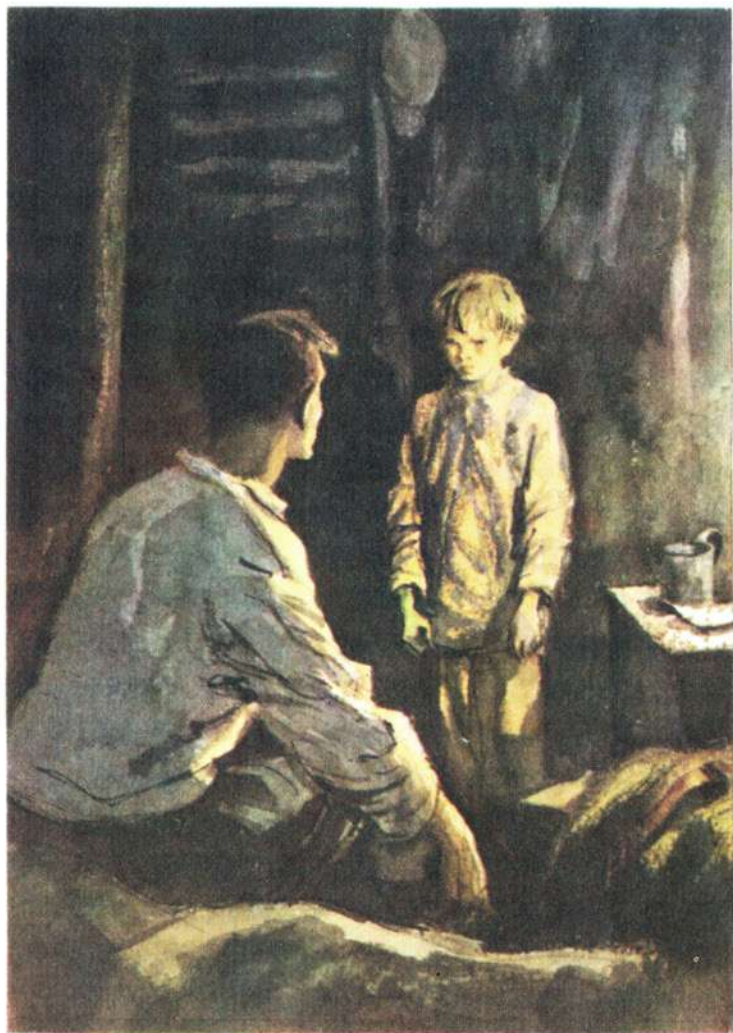
'তুমি কথা বলবে কি?'

'আপনি এক্ষুনি একান্ন নম্বর হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করুন যে আমি এখানে আছি,' সে তার জেদ ছাড়ল না।

'ওসব কিছুই আমি করব না,' আমি রেগে গিয়ে বললাম। 'তুমি কে, কোথা থেকে আসছ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে না বলছ ততক্ষণ আমি তোমার জন্য কিছুই করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!.. একান্ন নম্বরটা কে জানতে পারি কি?'

সে তার একগুঁয়ে একাগ্র ভাব বজায় রেখে চুপ করে রইল।

'তুমি কোথা থেকে আসছ?' অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'যদি চাও তোমার কথা আমি রিপোর্ট করি, তাহলে বল বলছি!'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, কঠিন ভাবনাচিন্তা করার পর দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল:

'ওপাড় থেকে।'

'ওপাড় থেকে?' আমার বিশ্বাস হল না। 'কী করে তুমি এখানে এলে তাহলে? ওপাড় থেকে যে এসেছ তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ আমি দিতে যাব না। এর বেশি আমি কিছু বলব না। আমাকে জিজ্ঞেসবাদ করার অধিকার আপনার নেই। এর জন্য আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। টেলিফোনেও কিছু বলতে যাবেন না। আমি যে ওপাড় থেকে এসেছি সে কথা জানে শুধু একান্ন নম্বর। আপনার উচিত হবে এক্ষুনি জানানো যে বন্দারেভ এখানে। ব্যস আর দেখতে হবে না! আমার খোঁজে লোক চলে আসবে!' সে দৃঢ়স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

'তবু, আশা করছি বলবে তুমি কে, কারা তোমার খোঁজে আসবে?'

সে চুপ করে রইল।

আমি কিছুক্ষণ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম। ওর নাম থেকে আমার আদৌ কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে এমনও হতে পারে যে আর্মির হেড কোয়ার্টারে লোকে ওর সম্পর্কে জানে? যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এখন আর কোন ব্যাপারেই আমি অবাক হই না।

তাকে করুণ ও অবসন্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার স্বাধীন ভাব বজায় রেখেছে এবং আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তার মনের দৃঢ়তা, এমনকি কর্তৃত্বের সুর প্রকাশ পাচ্ছে। সে আমার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে না — দাবি করছে। তার চেহারা যেমন গোমড়া, তার একাগ্র ও সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে যেমন কোন ছেলেমানুষীর পরিচয় নেই তাতে তাকে দেখে খুবই অদ্ভুত লাগছে। সে যে জোর দিয়ে বলছে যে ওপাড় থেকে আসছে, কথাটা আমার মনে হচ্ছিল যেন ডাহা মিথ্যা।

বলাই বাহুল্য ওর কথা সরাসরি আর্মি হেড কোয়ার্টারে জানানোর কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না, তবে রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে জানানো আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি ভেবে দেখলাম সেখান থেকে কেউ এসে ওকে নিয়ে যাবে, ওরাই ব্যাপারটার মীমাংসা করবে। ইতিমধ্যে, আউটপোস্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য বেরোনোর আগে আরও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানোর সময় আমি পাব।

আমি টেলিফোনের হাতল ঘুরিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারকে ডাকলাম।

'আমি তিন নম্বর, বলুন।' আমি স্টাফের চীফ ক্যাপ্টেন মাস্‌লভের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'কমরেড ক্যাপ্টেন, আট নম্বর রিপোর্ট করছে! বন্দারেভ

আমার এখানে। ব-ন্-দা-রেভ্! সে জোরাজুরি করছে যে তার সম্পর্কে 'ভোল্গা'কে যেন রিপোর্ট করা হয়...'

'বন্দারেভ?' মাস্লভ অবাক হয়ে আওড়াল। 'কোন্ বন্দারেভ? অপারেশন দলের মেজর, যে চেক-আপ করে, তার কথা বলছ নাকি? সে আবার তোমার কাছে এলো কোত্থেকে?' মাস্লভ আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলল। তার কণ্ঠস্বরে আমি উদ্বেগের আভাস পেলাম।

'আরে না না, কিসের মেজর! আমি নিজেই জানি না কে — কিছু বলছে না। কেবল জোরাজুরি করছে যে আমি যেন 'ভোল্গায়' একান্ন নম্বরকে রিপোর্ট করি যে সে আমার কাছে আছে।'

'একান্ন নম্বরটা কে আবার?'

'আমি ভাবলাম আপনি জানেন।'

'আমরা 'ভোল্গার' কল্-সাইন জানি না। জানি কেবল ডিভিশনের। কোন্ পদে আছে এই বন্দারেভ? তার র‍্যাঙ্কটা কী?'

'র‍্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক কিছু তার নেই,' বলার সময় আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। 'সে হল একটা বাচ্চা ছেলে... বুঝলেন, বছর বারো বয়সের এক বাচ্চা ছেলে...'

'তুমি কি তামাসা পেয়েছ নাকি?.. কাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ... অ্যাঁ?' ওদিক থেকে মাস্লভ গর্জন করে উঠল। 'এটা কি সার্কাসের খেলা পেয়েছ? ছেলে-টেলে তোমাকে আমি টের পাওয়াচ্ছি! আমি মেজরের কাছে রিপোর্ট করছি! তুমি মদ খেয়েছ নাকি, নাকি তোমার কিছু করার নেই? দাঁড়াও, আমি তোমার...'

'কমরেড ক্যাপ্টেন!' ব্যাপারটা এরকম মোড় নিয়েছে দেখে

আমি হকচকিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম। 'কমরেড ক্যাপ্টেন, সত্যি করে বলছি, একটা ছেলে। আমি ভেবেছিলাম, আপনি ওর কথা জানেন...'

'জানি না। জানার কোন ইচ্ছেও নেই!' মাস্‌লভ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল। 'তোমাকে বলে দিচ্ছি, আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসো না। তুমি আমাকে কচি খোকাটি পেয়েছ নাকি? কাজের চাপে অমনিতেই আমার কান মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, তার ওপর আবার উনি এলেন কিনা...'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে...'

'ওসব ভাবা-টাবা ছাড়!'

'তা যা বলেন, কমরেড ক্যাপ্টেন! কিন্তু ছেলেটাকে নিয়ে কী করব বলবেন কি?'

'কী করবে?.. তোমাদের ওখানে এলো কী করে বল ত?'

'আমাদের আউটপোস্টে নদীর পাড়ে ধরা পড়েছে।'

'কিন্তু নদীর পাড়ে এলো কী করে?'

'এলো কী করে?..' আমি মুহূর্তের জন্য আমতা-আমতা করে বললাম। 'বলছে, ওপাড় থেকে আসছে।'

'বলছে!' মাস্‌লভ ভেঙিয়ে বলল। 'ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে নাকি? ও তোমাকে টুপি পরাচ্ছে, আর তুমিও দিব্যি শুনে যাচ্ছ। ওকে পাহারায় রাখ!' সে হুকুম দিল। 'আর নিজে যদি কিছু বার করতে না পার, তাহলে জোতভের হাতে দিয়ে দাও। এটা ওদের কাজ — ওরাই করুক।'

'আপনি ওঁকে বলুন, উনি যদি তর্জনগর্জন করেন, এক্ষুনি যদি একান্ন নম্বরকে না জানান, তাহলে এর জন্য ওঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে,' ছেলেটা কোন রকম দ্বিধা সঙ্কোচ না করে হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল।

কিন্তু মাস্‌লভ ততক্ষণে রিসিভার ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে আমিও ছেলেটার ওপর — এবং তার চেয়েও বেশি মাস্‌লভের ওপর বিরক্ত হয়ে — আমার টেলিফোনের রিসিভার ছেড়ে দিয়েছি।

ঘটনাটা এই যে আমি শুধু সাময়িকভাবে ব্যাটেলিয়ন-কম্যান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। সকলেই জানত যে আমি 'সাময়িক'। তার ওপর আমার বয়স মাত্র একুশ বছর, তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে সকলে আর সব ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারের তুলনায় অন্য চোখে দেখত। রেজিমেন্ট-কম্যান্ডার ও তাঁর সহকারীরা তাদের আসল মনোভাব সযত্নে গোপন রাখার চেষ্টা করলেও, আমার ঊর্ধ্বতন রেজিমেন্টাল অফিসারদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট মাস্‌লভ কিন্তু আমাকে নেহাৎ বালক বলে গণ্য করত, আমার সঙ্গে সেই রকম আচরণও করত, যদিও যুদ্ধের সেই শুরু থেকে আমি লড়াই করে চলেছি, যুদ্ধে আমি আহত হয়েছি এবং কিছু পদকও পেয়েছি।

বলাই বাহুল্য প্রথম বা তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডারের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলার সাহস মাস্‌লভের হত না। কিন্তু আমার সঙ্গে... কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত না শুনে, বোঝার কোন চেষ্টা না করে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাস্‌লভ কাজটা ঠিক করে নি। সে যাই হোক না কেন, ছেলেটাকে কিন্তু আমি হিংস্র উল্লাস চেপে না রেখেই বললাম:

'তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার কথা রিপোর্ট করতে, আমি রিপোর্ট করেছি। আমার ওপর হুকুম হয়েছে তোমাকে পাহারায় রাখার,' আমি মিথ্যে করে বললাম। 'এখন তুমি খুশি ত?'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম আর্মি হেড কোয়ার্টারের একান্ন নম্বরকে জানাতে, কিন্তু আপনি তা করেন নি।'

'তুমি আমাকে বলেছিলে? — তাহলে আর কি! আমি আমার ওপরওয়ালাকে ডিঙিয়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারে কোন আবেদন করতে পারি না।'

'তাহলে দিন, আমিই ফোন করছি,' এই বলে ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে গায়ের কোর্তার ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রিসিভার চেপে ধরল।

'খবরদার বলছি! কাকে তুমি ফোন করবে? আর্মি হেড কোয়ার্টারের কাকে তুমি জান, শুনি?'

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তখনও রিসিভার হাত থেকে ছাড়ে নি। তারপর মুখ কালো করে বিড়বিড় করে বলল:

'লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভকে।'

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভ বাস্তবিকই ছিলেন আর্মির

গুপ্তচর দপ্তরের প্রধান। কেবল লোকপরম্পরায় নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও আমি তাঁকে চিনতাম।

'তাঁকে তুমি কী ভাবে চেন?'

কোন কথা নেই।

'আর্মি হেড কোয়ার্টারের আর কাকে তুমি চেন?'

এবারেও কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে দ্রুত ভ্রূকুটিল দৃষ্টি হেনে বিড়বিড় করে বলল, 'ক্যাপ্টেন খলিনকে চিনি।'

খলিন আর্মির গুপ্তচর দপ্তরের একজন অফিসার। তিনিও আমার চেনা।

'তাঁকে তুমি জানলে কী করে?'

'গ্রিয়াজ্‌নভকে এক্ষুনি জানান যে আমি এখানে,' আমার কথায় কোন আমল না দিয়ে ছেলেটা দাবি করল। 'নয়ত আমি নিজেই ফোন করব।'

আমি রিসিভারটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম, আরও মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে হাতল ঘুরালাম। আবার মাস্‌লভের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল।

'আবার আমি, আট নম্বর বলছি, কমরেড ক্যাপ্টেন। দয়া করে আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনুন,' আমি আমার উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতে দৃঢ়স্বরে বললাম। 'আবার সেই বন্দারেভের কথা বলছি। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্‌নভ আর ক্যাপ্টেন খলিনকে সে জানে।'

'কী ভাবে ওঁদের জানে?' ক্লান্তস্বরে মাস্‌লভ জিজ্ঞেস করল।

'সে কথা ও বলছে না। কিন্তু আমার মনে হয় লেফটেনাণ্ট কর্ণেলকে ওর কথা জানানো দরকার।'

'তোমার যদি মনে হয় ত রিপোর্ট কর গিয়ে,' মাস্‌লভ কেমন যেন ঔদাস্যভরে বলল। 'মোটের ওপর যত রাজ্যের আজেবাজে

জিনিস নিয়ে ওপরওয়ালাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই তোমার স্বভাব। আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে সদর দপ্তরের ওপরওয়ালাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কোন কারণই দেখি না, বিশেষত এই রাতের বেলায়। একেবারে ছেলেমানুষী!'

'তাহলে আমাকে ফোন করার অনুমতি দিচ্ছেন?'

'আমি কোন অনুমতি দিচ্ছি না। আমাকে এসবের মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা করো না। ...তবে হ্যাঁ, দুনায়েভকে অবশ্য ফোন করে দেখতে পার। আমি এইমাত্র তার সঙ্গে কথা বলেছি — এখনও ঘুমোয় নি।'

আমি ডিভিশনের গুপ্তচর প্রধান মেজর দুনায়েভের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাকে জানালাম বন্দারেভ আমার কাছে আছে, সে এক্ষুনি তার কথা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভকে জানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছে।

'ঠিক আছে,' আমাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে দুনায়েভ বললেন। 'অপেক্ষা করুন, আমি জানাচ্ছি।'

মিনিট দুয়েক বাদে টেলিফোন তীক্ষ্ন, কড়া সুরে গুনগুন করে উঠল।

'আট নম্বর?.. 'ভোল্গার' সঙ্গে কথা বলুন,' টেলিফোন অপারেটর বলল।

'গাল্ৎসেভ?.. হ্যালো গাল্ৎসেভ, কী খবর?' লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভের নীচু কর্কশ কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারলাম। চিনতে না পারার কোন কারণ ছিল না। গত গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত গ্রিয়াজ্নভ আমাদের ডিভিশনের গুপ্তচর প্রধান ছিলেন, আর আমি তখন ছিলাম সংযোগরক্ষাকারী অফিসার, তাই বেশ ঘন ঘন আমাকে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্দারেভ তোমার ওখানে নাকি?'

২

'হ্যাঁ কমরেড লেফটেনান্ট কর্ণেল, এখানে আছে।'

'সাবাস! (প্রশংসাটা আমাকে, না ছেলেটাকে — ঠিক কাকে করলেন বুঝতে পারলাম না।) এখন মন দিয়ে শোন। সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতর থেকে সকলকে তাড়িয়ে দাও। কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়, বিরক্ত না করে। কোন রকম জিজ্ঞেসবাদ নয়, কোন কথাও নয় ওর সম্পর্কে! বুঝেছ?.. আমার শুভেচ্ছা জানিও ওকে। খলিন ওকে নিতে যাবে। আশা করি ঘণ্টা তিনেক বাদে তোমার ওখানে আসবে। আপাতত ওর যা যা দরকার সেদিকে নজর দিও। ওর সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করবে, খেয়াল রাখবে কিন্তু — ছেলেটা মেজাজী ধরনের। প্রথমেই ওকে কাগজ আর কালি কিংবা পেন্সিল দাও। ও যা লিখবে সেটাকে একটা প্যাকেটে পুরে সঙ্গে সঙ্গে একজন নির্ভরযোগ্য লোক মারফত রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও। আমি হুকুম দেব দেরি না করে যেন আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ওর সমস্ত রকম সুবিধার দিকে নজর রাখবে, কথাবার্তা বলে ওকে ঘাঁটিও না। গা-হাত-পা ধোয়ার জন্য খানিকটা গরম জল দাও, কিছু খেতে দাও, ঘুমোতে দাও ওকে। ছোকরা আমাদের লোক। বুঝলে ত?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' আমি উত্তর দিলাম, যদিও অনেক জিনিসই আমার কাছে স্পষ্ট হল না।

* * *

'কিছু খাবে?' প্রথমেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'পরে,' চোখ না তুলেই ছেলেটি বলল।

আমি তখন তার সামনে টেবিলের ওপর কাগজ, খাম, কলম আর কালি এনে রাখলাম, তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে

ভাসিলিয়েভকে পোস্টে রওনা দেবার আদেশ দিলাম এবং ঘরে ফিরে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

চুল্লীর আগুন গনগনে লাল হয়ে জ্বলছে। তার দিকে পিঠ করে ছেলেটি বেঞ্চের কিনারায় বসে ছিল। যে ভিজে প্যাণ্টটা এর আগে সে ঘরের এক কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেটা তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। প্যাণ্টের একটা পকেট সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। সেই পকেটটা থেকে সে বার করল একটা নোংরা রুমাল। রুমালের ভাঁজ খুলে সে গম ও রাইয়ের দানা, সূর্যমুখী ফুলের বীচি আর পাইন ও ফারের ছুঁচ ঢেলে আলাদা আলাদা এক একটা থোকা করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর প্রতিটি থোকায় কটা আছে খুব মনোযোগ দিয়ে গুনে কাগজে লিখল।

আমি টেবিলের দিকে এগোতে সে চটপট কাগজের পাতাটা উলটে দিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'না না, আমি দেখছি না, আমি দেখছি না,' ব্যস্ত হয়ে আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম।

ব্যাটেলিয়নের হেড কোয়ার্টারে ফোন করে আমি হুকুম দিলাম অবিলম্বে যেন দু বালতি জল গরম করে একটা বড় গামলা সমেত সুড়ঙ্গ-ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সার্জেণ্ট আমার হুকুমটা মুখে আওড়াতে রিসিভারের মধ্য দিয়ে তার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য হওয়ার ভাব টের পেলাম। আমি জানালাম যে আমি একটু গা-হাত-পা ধুতে চাই। এদিকে রাত তখন দেড়টা। মাস্‌লভের মতো সেও হয়ত ভেবে নিল যে আমি মদ টেনেছি, নয়ত আমার কিছু করার নেই। এ ছাড়া পাঁচ নম্বর কোম্পানিতে ত্‌সারিভ্‌নি নামে যে চটপটে সৈন্যটি ছিল তাকে রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে পাঠানোর জন্য মোতায়েন রাখতে বললাম।

টেবিলের দিকে পাশ করে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলতে

বলতে আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ছেলেটা কাগজের টুকরোর ওপর আড়াআড়ি ও খাড়া কতকগুলি লাইন এ'কেছে, বাঁ দিকের একেবারে শেষ সারিতে ওপর থেকে নীচে করে বড় বড় ছেলেমানুষী হস্তাক্ষরে লিখছে '... ২... ৪... ৫...' এই রকম সব সংখ্যা। সংখ্যাগুলির অর্থ যে কী এবং তারপরই বা সে আর কী লিখল আমি জানতে পারলাম না — এমন কি পরেও নয়।

কলম দিয়ে কাগজের ওপর খসখস আওয়াজ তুলে, ফোঁস ফোঁস করে নাক টানতে টানতে, হাতা দিয়ে কাগজের টুকরো আড়াল করে অনেকক্ষণ ধরে, প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে সে লিখে চলল। তার হাতের আঙুল বে'টে-বে'টে, নখগুলি খাওয়া-খাওয়া, ভেতরে বসা; ঘাড় আর কান দেখলে বোঝা যায় বহু কাল জলের ছোঁওয়া পড়ে নি। মাঝে মাঝে সে থেমে অস্থির হয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ভাবছিল কিংবা কিছু মনে করার চেষ্টা করছিল, নাক টানতে টানতে ফের লিখছিল। ইতিমধ্যে গরম আর ঠাণ্ডা জল চলে এসেছে। কাউকে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে আমি নিজেই বালতি আর গামলা ভেতরে বয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু ও তখনও কলম খসখস করে চলেছে। জল যাতে গরম থাকে তার জন্য আমি জলসুদ্ধ বালতিটা চুল্লীর ওপর রেখে দিলাম।

লেখা শেষ করে কাগজগুলো আধাআধি ভাঁজ করে সে খামের ভেতরে পুরল, থুতু দিয়ে যত্ন করে খামের মুখ আঁটল। তারপর আরও বড় সাইজের একটা খাম নিয়ে তার ভেতরে আগের খামটা পুরে ঐ রকমই যত্ন করে সেটারও মুখ আঁটল।

বার্তাবহ সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছাকাছিই অপেক্ষা করছিল। আমি বাইরে এসে প্যাকেটটা তাকে দিয়ে বললাম:
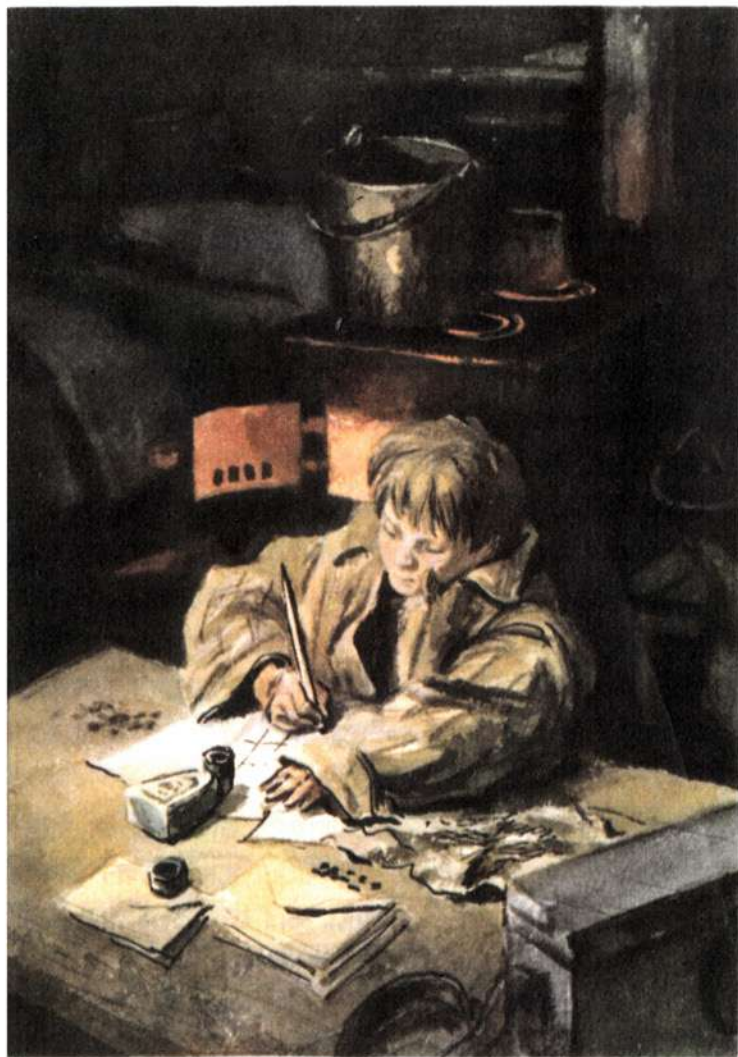
‘চটপট রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে দিয়ে আসবে। ভীষণ জরুরী! কাজ শেষ হলে ক্রায়েভকে রিপোর্ট করবে।’

তারপর আমি ফিরে এসে একটা বালতির মধ্যে খানিকটা ঠান্ডা জল ঢেলে জলটা একটু ঠান্ডা করে দিলাম। ছেলেটা গায়ের কোর্তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গামলার ভেতরে বসে গা-হাত-পা ধুতে শুরু করল।

ওর সামনে নিজেকে আমার দোষী-দোষী মনে হতে লাগল। সে যে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নি নিঃসন্দেহে তার পেছনে ঐ রকম কোন নির্দেশ ছিল, অথচ আমি তার ওপর চোটপাট করেছি, তাকে ভয় দেখিয়েছি, যা জানা আমার এক্তিয়ারের বাইরে সে খবর ওর কাছ থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করেছি। কে না জানে, স্কাউটদের এমন সব নিজস্ব গোপনীয় বস্তু থাকে যা ঊর্ধ্বতন স্টাফ অফিসারদেরও জানার কথা নয়, জানার অধিকার নেই।

এখন আমি নার্সের মতো তার সেবা করতে প্রস্তুত। এমনকি আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমি নিজেই ওর গা-হাত-পা ধুইয়ে দিই, কিন্তু আমি ঠিক ভরসা করতে পারলাম না — ও আমার দিকে তাকাচ্ছিলই না, আমাকে যেন লক্ষই করছিল না। ওর ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুড়ঙ্গ-ঘরে ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন প্রাণী নেই।

‘দাও, আমি তোমার পিঠ ঘসে দিই,’ ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে না পেরে বলে ফেললাম।

‘আমি নিজেই পারব,’ তার কাটা জবাব।

আমার তখন যা করার থাকল তা হল পরিষ্কার তোয়ালে আর যে শার্টটা ওর পরার কথা সেটা হাতে করে চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল্লীর ওপরে রাখা ডেকচির জাউ

ও মাংস ঘাঁটা। প্রসঙ্গত, এটা ছিল আমার রাতের খাবার। সৌভাগ্যবশত সেদিন রাতে খাবার আমি ছুঁই নি।

ধুয়ে সাফ হয়ে আসার পর দেখা গেল তার চুল হালকা রঙের, গায়ের চামড়া সাদা। শুধু হাতের কবজি আর মুখের রঙ একটু কালো — জলে হাওয়ায় কিংবা রোদে পুড়ে হতে পারে। তার কানদুটো ছোট ছোট, গোলাপী রঙের, বেশ নরম-তরম, তাছাড়া আমি এও লক্ষ করলাম যে অসম ধরনের — ডান দিকেরটা চাপা, কিন্তু বাঁয়েরটা একটু উঁচিয়ে আছে। গালের হাড় বার-করা মুখের ওপর যেটা লক্ষ করার মতো তা হল তার চোখজোড়া — বড় বড়, সবজে আভার; দুই চোখের মাঝখানের ব্যবধান অবাক করার মতো — এর আগে আর কখনও কারও দুই চোখের মাঝখানে এতটা ব্যবধান দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সে ধুয়ে মুছে শুকনো খটখটে হয়ে উঠল। শার্টটা চুল্লীর পাশে থাকায় দিব্যি গরম-গরম হয়ে এসেছিল। আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে সে গায়ে দিল, সযত্নে হাতা গুটিয়ে টেবিলের ধারে এসে বসল। তার চোখেমুখে এখন আর সেই সতর্কতা ও এড়িয়ে চলার ভাব দেখা গেল না। ওকে ক্লান্ত, গম্ভীর আর চিন্তাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

আমার আশা ছিল খাবারের ওপর ও হামলে পড়বে, কিন্তু খিদের কোন লক্ষণ সে দেখাল না — চামচ দিয়ে বার কয়েক খুঁটে খুঁটে খাবার মুখে তুলে ডেকচিটা সরিয়ে রেখে দিল। তার পর ঐরকমই চুপচাপ আমার অতিরিক্ত রেশনের একটা বিস্কুট সহযোগে বেজায় মিষ্টি এক মগ চা পান করল। চায়ে মিষ্টি ঢালার ব্যাপারে আমার অবশ্য এতটুকু কার্পণ্য ছিল না। চা পানের পর সে উঠে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'ধন্যবাদ।'

ইতিমধ্যে আমি গামলাটা এক ফাঁকে বাইরে রেখে এসেছি।

গামলার জল যেন কালি গোলা — কেবল জলের ওপর সাবানের ছাই-ছাই নোংরা ফেনা ভাসছে। এরপর আমি বাঙ্কের ওপর বালিশও ফাঁপিয়ে ঠিকঠাক করে রাখলাম। ছেলেটা আমার বিছানায় গিয়ে উঠল, গালের নীচে হাতের তালু রেখে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। আমার সমস্ত কার্যকলাপকে সে স্বাভাবিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম সে 'ওপাড় থেকে' এই প্রথম আসছে না, সে জানে আর্মির হেড কোয়ার্টার তার আসার খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার 'সমস্ত রকম সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেবার' নির্দেশ পাঠাবে... দুটো কম্বল তার গায়ে চাপা দিয়ে কোন এক কালে আমার মা আমার জন্য যেমন করতেন তেমনি সযত্নে কম্বলের সবগুলো দিক আমি বিছানার তলায় গুঁজে দিলাম।

দুই

কোন রকম সাড়াশব্দ যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিয়ে আমি বেরোবার উদ্যোগ করলাম। হেলমেট মাথায় দিলাম, গ্রেটকোটের ওপর হাতা-ছাড়া বর্ষাতি ফেলে টমিগান হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সান্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে গেলাম আমার অনুপস্থিতিতে কাউকে যেন ভেতরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

বাদলা রাত্। বৃষ্টি অবশ্য ইতিমধ্যে থেমে গেছে, কিন্তু দমকা উত্তুরে বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা আর অন্ধকার।

আমাদের আর জার্মানদের মাঝখানে নীপার নদী। নীপারের আধ মাইলটাকের মধ্যে বড় বড় গাছের নীচে, ঝোপঝাড়ের ভেতরে

আমার সুড়ঙ্গ-ঘর। ওদিকে পাড়টা উঁচু হওয়ায় ওদের অবস্থা সুবিধাজনক। আমাদের সামনের লাইন তাই নিয়ে আসা হয়েছে ভেতরে, খানিকটা অনুকূল পজিশনে। এদিকে সরাসরি নদীর এলাকায় বসানো ছিল আমাদের আউটপোস্ট সাব-ইউনিট।

দূরে শত্রুপক্ষের তীরভূমি থেকে রকেটের যে ঝলক দেখা যাচ্ছিল প্রধানত তারই আলোয় আমি অন্ধকারের মধ্যে পথ ঠিক করে বনের ভেতরকার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলছিলাম। জার্মান রক্ষাব্যূহের সমস্ত লাইন জুড়ে রকেটগুলি এখান ওখান থেকে সমানে উড়ছিল। দমকে দমকে মেশিনগানের গুলিতে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছিল নৈশ নিস্তব্ধতা। রাতের বেলায় জার্মানরা ঠিক নিয়ম করে — আমাদের রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের কথায়, 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিশেবে' — মিনিট কয়েক অন্তর আমাদের উপকূল এলাকা লক্ষ্য করে, স্রেফ নদীর বুকেও গোলাগুলি ছুঁড়ত।

নীপারের কাছাকাছি বেরিয়ে এসে আমাদের সবচেয়ে কাছের আউটপোস্ট যেখানে ছিল সেখানকার ট্রেঞ্চের দিকে আমি রওনা দিলাম এবং আউটপোস্ট প্লেটুনের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে আমার কাছে ডেকে পাঠানোর হুকুম দিলাম।

কম্যাণ্ডিং অফিসার ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নদীর তীর বরাবর এগিয়ে চললাম। সে সঙ্গে সঙ্গে 'বাচ্চাটা' সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করল — হয়ত ধরে নিয়েছিল যে ছেলেটাকে আটক করার সঙ্গে আমার আগমনের কোন সম্পর্ক আছে। তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়লাম; এদিকে আমি নিজে কিন্তু বারবার ঘুরেফিরে ছেলেটার কথা চিন্তা না করে পারছিলাম না।

আমি অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা বিপুল জলরাশির দিকে

তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। নীপার এই জায়গায় প্রায় আধ মাইল চওড়া। বন্দারেভের মতো ছোট একটা ছেলে যে ওপাড় থেকে আসতে পারে একথা কেন যেন আমার কোনমতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। যারা তাকে পার করে দিয়ে গেছে তারা কারা? কোথায় তারা? নৌকাই বা কোথায়? আউটপোস্টের প্যাট্রোল তাকে দেখতে পেল না কেন? নাকি ওকে ওরা তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই জলে ছেড়ে দেয়? এমন একটা রোগা, দুর্বল ছেলেকে শরৎকালের এরকম ঠান্ডা জলের মধ্যে ওরা ছেড়ে দিলই বা কী বলে?

আমাদের ডিভিশন প্রতিরোধ ভেঙে নীপার পার হবার তোড়জোড় করছিল। আমি যে নির্দেশ পেয়েছি পড়তে পড়তে সেটা আমার প্রায় মুখস্থও হয়ে গেছে। সুস্থ সবল বয়স্ক লোকদের জন্য দেওয়া সেই নির্দেশে বলা হয়েছে: '...কিন্তু জলের তাপমাত্রা যদি +১৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের নীচে হয়, তাহলে একজন ভালো সাঁতারুর পক্ষে পর্যন্ত সাঁতরে পার হওয়া রীতিমতো কঠিন, আর নদী চওড়া হলে ত একেবারেই অসম্ভব।' +১৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের নীচে হলে এই অবস্থা, কিন্তু তাপমাত্রা যদি +৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড মতন হয়, তাহলে?

না, নৌকো যে তীরের কাছাকাছি এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলে কেউ দেখতে পেল না কেন? ছেলেটাকে তীরে নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল, কারও নজরে পড়ল না — এটা কী করে সম্ভব হল? আমি ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারলাম না।

অথচ আউটপোস্ট পুরোমাত্রায় সতর্ক। শুধু নদীর একেবারে ধার ঘেঁসে উঠিয়ে নিয়ে আসা একটা ফক্স-হোলের মধ্যে আমরা একজন ঝিমন্ত সৈন্যকে দেখতে পেলাম। লোকটা ট্রেঞ্চের দেয়ালে

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, তার মাথার হেলমেট চোখের ওপর নেমে এসেছে। আমরা আসা মাত্র সে ধড়মড় করে উঠে টমিগান আঁকড়ে ধরল, অর্ধজাগ্রত অবস্থাতেই আরেকটু হলে এক রাউন্ড গুলি আমাদের ওপর ঝেড়ে দিচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে বদলানোর এবং শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করার হুকুম দিলাম; এর আগে অবশ্য চাপাস্বরে লোকটাকে এবং স্কোয়াড কম্যান্ডারকেও কষে গালাগাল দিতে ছাড়ি নি।

পরিদর্শন শেষ করার পর আমরা রক্ষাব্যূহের ডান পাশের পরিখার বাইরে মাটির স্তূপের আড়ালে বসে সৈন্যদের সঙ্গে ধূমপান করতে লাগলাম। মেশিনগানের চত্বর সমেত এই বিরাট পরিখাটায় সৈন্য ছিল চার জন।

'কমরেড সিনিয়র লেফটেনান্ট, সেই বিচ্ছুটার ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন?' ওদের মধ্যে একজন ভাঙা ভাঙা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল। লোকটা ধূমপান করছিল না; মেশিনগানের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছিল।

'কেন? কী ব্যাপার?' আমি সতর্ক হয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

'অমনি বলছিলাম আর কি। মনে হয়, তেমন সহজ নয়। এমন দুর্যোগের রাতে একটা কুকুরকে অবধি তাড়া দিয়ে ঘর থেকে বার করা যায় না, আর ও কিনা নদীতে নামল! কী এমন দরকার পড়েছিল?.. ও কি নৌকোর খোঁজ করছিল? ওপাড়ে যাবার তাল করছিল? কিন্তু কেন?.. বড় গন্ডগোলে কিন্তু ছোঁড়াটা — ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখা দরকার ওটাকে! আচ্ছা করে চেপে ধরতে হয়, যাতে ও মুখ খোলে, যাতে আসল কথা বেরিয়ে আসে।'

'হ্যাঁ, গন্ডগোল কিছু আছে বলে মনে হয়,' কতকটা অনিশ্চিত

সুরে আরেকজন বলল। 'মুখে কোন কথা নেই, চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে একটা নেকড়ে ছানার মতো। আর জামাকাপড় নেই কেন গায়ে?'

'ছেলেটা এসেছে নভসেল্‌কি থেকে,' আমি ধীরেসুস্থে টেনে টেনে মিথ্যে করে বললাম। (নভসেল্‌কি আমাদের এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরের একটা বড় গ্রাম। গ্রামের অর্ধেক জার্মানরা জ্বালিয়ে দিয়েছে)। 'ওর মাকে জার্মানরা জার্মানিতে নিয়ে গেছে, ও নিজে এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। এমন অবস্থায় নদীতে নামাটা আর বিচিত্র কি!'

'আচ্ছা, তাই বল।'

'আহা বেচারা, বড় দুঃখ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমবেদনার সুরে একজন প্রবীণ যোদ্ধা বলল। লোকটা আমার মুখোমুখি উবু হয়ে বসে ধূমপান করছিল। সিগারেটের আলোয় তার কয়েকদিনের বাসি খোঁচা খোঁচা দাড়ি সমেত কালো রঙের চওড়া মুখটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। 'মনের দুঃখের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে! এদিকে ইউরলভটা মানুষের মধ্যে সব সময় মন্দটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। এটা ঠিক নয়,' মেশিনগানের পাশে যে সৈন্যটা দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে ফিরে বিবেচকের মতো, ভদ্রভাবে সে বলল।

'আমি হুঁশিয়ার,' ভাঙা ভাঙা গলায় জেদের সুরে জানাল ইউরলভ। 'যত যা-ই নিন্দা করিস না কেন আমার, আমাকে তুই বদলাতে পারবি নে! তোদের সবেতে বিশ্বাস করা এই ভালোমানুষী আমার দু'চক্ষের বিষ। এই এত বিশ্বাস করেই ত সীমান্ত থেকে মস্কো অবধি মাটি রক্তে ভিজে গেল! আর নয়!.. ভালোমানুষী আর লোকের ওপর বিশ্বাস তোর যদি এতই থাকে, তাহলে জার্মানদের তা থেকে অন্তত এই এতটুকু ধার দে না —

ওরা ওদের মনে তার প্রলেপ লাগাক!.. আপনি একটা কথা বলুন দেখি আমাকে, কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট, ওর জামাকাপড় কোথায়? যা-ই হোক না কেন জলের মধ্যে সে কী করছিল, শুনি? গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত। আমার মনে হয় সন্দেহজনক।'

'ইশ্, দেখ কান্ড! কৈফিয়ত চাইছে যেন ওর নীচের কোন কর্মচারীর কাছ থেকে!' বাঁকা হাসি হেসে প্রৌঢ় বলল। 'ছেলেটাকে নিয়ে তোর খুব যে মাথাব্যথা দেখছি! তোকে ছাড়া যেন ওরা ফয়সালা করতে পারবে না। তুই বরং আমাদের কম্যান্ডকে জিজ্ঞেস কর্ আমাদের কিছু ভোদ্কা দেবার বিষয়টা তারা বিবেচনা করে দেখেছে কি? ঠান্ডায় মরে যাবার দশা আমাদের; শরীর গরম করার মতো কিছু নেই। কবে থেকে দিতে শুরু করবে, শিগগির দেবে কিনা — সে কথা বরং জিজ্ঞেস কর্। ছেলেটার ব্যাপার ওরা নিজেরাই বুঝবে...'

আরও কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে বসে কাটানোর পর আমার মনে পড়ল শিগগিরই খলিনের আসার কথা, তাই ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। ওদের বললাম আমার সঙ্গে কোন লোক দেবার দরকার নেই। খানিকক্ষণ বাদেই অবশ্য এর জন্য আমাকে পস্তাতে হল — অন্ধকারের মধ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেললাম — পরে বুঝতে পারলাম অনেকটা ডান দিকে চলে এসেছি। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ এলোপাতাড়ি পথ চললাম, সান্ত্রীদের রুক্ষ চিৎকারে পথে আমাকে কয়েকবার থামতেও হল। আধ ঘণ্টার আগে আমি আমার সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে পৌঁছুতেই পারলাম না। যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় জমে গেছি।

ছেলেটা ঘুমোয় নি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বাঙ্কের ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে একটিমাত্র জামা গায়ে সে

বসে ছিল। চুল্লী অনেকক্ষণ হল নিভে গেছে। সুড়ঙ্গ-ঘরে বেশ ঠাণ্ডা — নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে হালকা ভাপ বেরোতে দেখা যাচ্ছে।

'এখনও এলো না?' ছেলেটা সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

'না। তুমি ঘুমোও, ঘুমিয়ে থাক। এলেই জাগিয়ে দেব।'

'পেঁছেছে ত?'

'কে?' আমি বুঝতে পারলাম না কার কথা বলছে।

'সেই যে যার হাত দিয়ে প্যাকেটটা পাঠানো হল।'

'পেঁছে গেছে,' আমি বললাম, যদিও আমি জানতাম না। আসল কথা হল সংযোগকর্মীটিকে পাঠানোর পর তার বা প্যাকেটটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে ছেলেটা ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আচমকা — এবং আমার মনে হল খানিকটা যেন উদ্বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল:

'আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন আপনি কি এখানে ছিলেন? আমি কি ঘুমের মধ্যে কথা বলেছিলাম?'

'না, আমি শুনি নি। কেন? কী হয়েছে?'

'না, অমনি। আগে কখনও বলতাম না। কিন্তু এখন — জানি না। কেমন যেন একটা অস্থির ভাব আমাকে পেয়ে বসেছে,' দুঃখ করে সে বলল।

শিগগিরই খলিন এসে পড়ল। সুন্দর চেহারা, লম্বা, গাঢ় রঙের চুল, বছর সাতাশেক বয়স হবে। হাতে একটা বিরাট জার্মান স্যুটকেস নিয়ে সে হুড়মুড় করে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। না থেমেই ভিজে স্যুটকেসটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সে ছুটে গেল ছেলেটার কাছে।

'ইভান!'

খলিনকে দেখামাত্র ছেলেটা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল, সে হাসল। এই প্রথম সে আনন্দে হাসল, শিশুর হাসি হাসল।

নিঃসন্দেহে এই সাক্ষাৎকার ছিল দুই পরম বন্ধুর সাক্ষাৎকার। এই মুহূর্তে আমি এখানে বাড়তি লোক। ওরা বয়স্কদের মতো কোলাকুলি করল। খলিন ছেলেটাকে বার কয়েক চুমো খেল, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তার রোগা সরুসরু কাঁধজোড়া হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল, তারপর বলল:

'...কাতাসনভ নৌকো নিয়ে দিকভ্কার কাছে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, আর তুমি কিনা এখানে...'

'দিকভ্কা জার্মানরা ছেয়ে ফেলেছে — পাড়ের দিকে এগোনোর উপায় নেই,' ছেলেটা কাচুমাচু হয়ে হেসে বলল। 'আমি সস্নোভ্কার দিক থেকে সাঁতরে এসেছি। জানো, মাঝ

নদীতে আমি একেবারে নেতিয়ে পড়েছিলাম। তার ওপর ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপুনি! — ভাবলাম বোধ হয় হয়ে গেল...'

'তার মানে, তুমি সাঁতরে এসেছ নাকি?' অবাক হয়ে চিৎকার করে বলল খলিন।

'হ্যাঁ, একটা গুঁড়ি ধরে। দোহাই তোমার, বকাবকি করো না— এছাড়া উপায় ছিল না। উজানের দিকে নৌকো চলেছে, সব জায়গায় পাহারা। আর তোমাদের ডিঙি নৌকো — তোমার কি ধারণা অমন অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে বার করা অতই সোজা? নির্ঘাত ওদের খপ্পরে পড়ে যেতাম! জানো, নেতিয়ে ত পড়েছি, এদিকে গুঁড়িটাও সমানে ঘুরছে, পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে, পাও অসাড় হয়ে পড়েছে। ভাবলাম, আর দেখতে হবে না, দফা-রফা হয়ে গেল! নদীর স্রোত! — স্রোতে গুঁড়ি ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ত চলেইছে... কী করে যে ভাসতে ভাসতে এলাম জানি না।'

সম্লোভ্‌কা নদীর উজানের মুখে ওপাড়ের একটা গ্রাম — শত্রুপক্ষের দখলে। তার মানে ছেলেটা অন্তত দু মাইল ওরকম ভাসতে ভাসতে এসেছে। বাদলা রাতে, অক্টোবরের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে এরকম দুর্বল একটা ছেলে যে শেষ পর্যন্ত ডুবে না গিয়ে ভেসে থাকতে পেরেছিল এটা পরম আশ্চর্য ছাড়া আর কী হতে পারে!

খলিন ঘুরে দাঁড়িয়ে পরম উৎসাহভরে ঝট করে তার পেশীবহুল হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করল, তারপর স্যুটকেসটা নিয়ে আলতো করে বাঙ্কের ওপর নামিয়ে রেখে খুট করে তালা খুলল। আমাকে অনুনয় করে বলল:

'যাও দেখি, গাড়িটাকে আরেকটু কাছে নিয়ে এসো, আমরা আর এগোতে পারি নি। আর সান্ত্রীকে বলবে এখানে যেন কাউকে

ঢুকতে দেওয়া না হয়; সে নিজেও যেন না আসে — আমরা চাই না কোন সাক্ষী থাকে। বুঝেছ?'

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজনভের এই 'বুঝেছ' কেবল আমাদের ডিভিশনেই নয়, আর্মির হেড কোয়ার্টারেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল।

মিনিট দশেক বাদে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করার পর গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে সুড়ঙ্গ-ঘরে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে আমি যখন ফিরে এলাম তখন ছেলেটার ভোল সম্পূর্ণ পালটে গেছে।

তার গায়ে একটা ছোট পশমী ফিল্ড-শার্ট — বোঝাই যাচ্ছিল, তার জন্য বিশেষ করে তৈরি। শার্টের ওপরে পিতৃভূমির যুদ্ধের অর্ডার আর ঝকঝকে নতুন একটা 'বীরত্ব পদক' আঁটা, ঘাড়ে সাদা ধবধবে ব্যাণ্ড। এছাড়া তার পরনে ছিল গাঢ় নীল রঙের সালোয়ার আর ভালো চামড়ার নিখুঁত হাইবুট। চেহারা দেখে তাকে মনে হচ্ছিল একজন সামরিক শিক্ষার্থী — এরকম সামরিক শিক্ষার্থী আমাদের রেজিমেণ্টে বেশ কয়েকজন ছিল — তবে তফাতটা এই যে ওর ফিল্ড-শার্টের ওপরে সামরিক কাঁধ-পটি নেই; তাছাড়া সামরিক শিক্ষার্থীরা দেখতে ওর তুলনায় অনেক সুস্থ ও সবল।

বেশ ধীরস্থির ভঙ্গিতে টুলের ওপর বসে সে খলিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। আমি ঘরে ঢুকতে চুপ করে গেল। দেখেশুনে আমার এটাই ধারণা হল যে কোন সাক্ষী ছাড়া তার সঙ্গে যাতে কথা বলা যায় সেই জন্যই বুঝি খলিন আমাকে গাড়ির সন্ধানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি সে বরং অসন্তুষ্ট হয়েই আমাকে বলল:

'কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে, অ্যাঁ? আরও একটা মগ নিয়ে এসে বসে পড়।'

যে সমস্ত খাবার-দাবার সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেগুলো ইতিমধ্যে টাটকা খবরের কাগজ বিছিয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। খাবারের মধ্যে ছিল শুয়োরের চর্বি, সসেজ, দুটো টিনের কৌটোয় মাংস, এক প্যাকেট বিস্কুট, দুটো কাগজের ঠোঙায় আরও কী যেন, বনাত কাপড়ের খোলে একটা জলের ফ্লাস্ক। বাঙ্কের ওপর পড়ে ছিল ছেলেটার সাইজের একটা কোট— ভেড়ার চামড়ার, আনকোরা নতুন, চমৎকার দেখতে, আর অফিসারের কান-ঢাকা ফার ক্যাপ।

খলিন ছেলেটার দিকে চট করে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে বলল:

'এবারে কিন্তু তুমি সুভরভ স্কুলে* গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে অফিসার হতে পার।'

'না, সে পরের কথা!' ছেলেটা আপত্তি করল। 'এখন যুদ্ধ চলছে,' সে বলল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, তর্ক করতে যাব না।'

খলিন বেশ যত্ন করে কিছু স্যান্ডউইচ বানিয়ে ছেলেটার সামনে রাখল। একটা স্যান্ডউইচ উঠিয়ে নিয়ে সে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

'খাও, খাও, খেতে থাক!' খলিন নিজে সোৎসাহে স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে বলল।

---

* **সুভরভ স্কুল** — সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমিক সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সামরিক বিদ্যায়তনে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের তালিম দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত রুশ সেনানায়ক আলেক্সান্দর সুভরভের নামে এর নামকরণ।

'অভ্যেস অনেকটা চলে গেছে,' ছেলেটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'খেতে পারছি না।'

খলিনকে সে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছিল, কথা বলছিল শুধু তার দিকে তাকিয়ে — আমাকে যেন লক্ষই করছিল না। আমি আর খলিন জোর সাঁটাতে লাগলাম — আমাদের চোয়াল ঘন ঘন নড়তে লাগল। কিন্তু ছেলেটা দুটো ছোট ছোট স্যান্ডউইচ খাওয়ার পর তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে বলল, 'বেশ হল।'

খলিন তখন রঙচঙে কাগজে মোড়া এক ঠোঙা চকোলেট তার সামনে টেবিলের ওপর উপুড় করে দিল। মিষ্টি দেখে সচরাচর তার বয়সী ছেলেমেয়েদের যেমন হয় ছেলেটার চোখেমুখে কিন্তু তেমনি আনন্দ ও উৎসাহের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে ধীরেসুস্থে, যেমন উদাসীন ভাবে একটা মিষ্টি তুলে নিল তাতে লোকের মনে হতে পারে বুঝি রোজ রোজ চকোলেট খেয়ে খেয়ে তার অরুচি ধরে গেছে। মোড়ক খুলে খানিকটা কামড়ে খেয়ে মিষ্টিগুলো টেবিলের মাঝখানে সরিয়ে দিয়ে সে আমাদের বলল, 'নিন, আপনারা নিন।'

'না ভাই,' খলিন মাথা নেড়ে বলল, 'ও আমাদের চলবে না।'

'তাহলে যাওয়া যাক,' টেবিলের দিকে আর না তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটি হঠাৎ বলল। 'লেফটেনান্ট কর্ণেল আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাহলে আমরা আর বসে আছি কেন? গেলেই হয়!' সে দাবির সুরে বলল।

'এই এখুনি যাব,' খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে খলিন বলল।

ছেলেটা ততক্ষণে টুপিটা মাথায় ঠিক হয় কিনা মেপে দেখছিল।

'ধুত্তোর, এ যে বড় হয় দেখছি!'

'এর চেয়ে ছোট মাপের ছিল না। আমি নিজে পছন্দ করে এনেছি,' অনেকটা কৈফিয়তের সুরে খলিন বলল। 'কিন্তু আমাদের কোন রকমে পেঁছুন নিয়ে কথা, পরে ভেবে একটা উপায় বার করা যাবে।'

সে করুণ চোখে টুকিটাকি খাবার-দাবারে সাজানো টেবিলটার দিকে তাকাল, আমার দিকে বিমর্ষ দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বোঝ, ভালো ভালো কত জিনিস বরবাদ হচ্ছে, এঃ!'

'ওঁর জন্য রেখে যাও,' ছেলেটা বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল। 'তোমার খিদে আছে নাকি এখনও?'

'না, না, তা কেন হতে যাবে?..' খলিন বলল। 'তাছাড়া এই লজেন্স-টফিগুলো — ওর কীই বা কাজে লাগবে?..'

'অত কিপ্টেমি করো না!'

'যাক গে, এছাড়া আর উপায়ই বা কী?' ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলল খলিন, তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'পথ থেকে সান্ত্রীকে সরিয়ে দাও — কেউ যেন আমাদের দেখতে না পায়।'

আমার হাতা-ছাড়া বর্ষাতিটা বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছিল — সেটা গায়ের ওপর ফেলে আমি ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর ভেড়ার চামড়ার কোটের হুকগুলো আঁটতে আঁটতে খলিন বড়াই করে বলল, 'গাড়িতে প্রচুর খড় আছে — রীতিমতো খড়ের গাদা! আমি কম্বল সঙ্গে নিয়েছি, বালিশও আছে। এক্ষুনি ধপ্ করে গিয়ে শুয়ে পড়ব — হেড কোয়ার্টারে পেঁছুনোর আগে পর্যন্ত টেনে একটা ঘুম লাগাব।'

'আচ্ছা ইভান, বিদায়,' এই বলে আমি ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'বিদায় নয়, আবার দেখা হবে!' তার খুদে সরু হাতের তালুটা আমার হাতের থাবার ভেতরে গুঁজে দিয়ে সে গম্ভীর

ভাবে আমাকে শুধরে দিল, আমার ওপর ভ্রূকুটিল দৃষ্টি হানল।

গুপ্তচর দপ্তরের ক্যানভাস ঢাকা 'ডজ' গাড়িটা সুড়ঙ্গ-ঘরের দশ পা খানেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা চট করে আমার নজরে পড়ল না।

আমি মৃদুস্বরে সান্ত্রীকে ডাকলাম, 'রদিওনভ!'

'বলুন, কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট!' খুব কাছে আমার পেছনে শুনতে পেলাম ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর। ঠাণ্ডা লেগে গলা ভেঙে গেছে।

'স্টাফের সুড়ঙ্গ-ঘরে চলে যান। আমি শিগগিরই আপনাকে ডেকে পাঠাব।'

'যে আজ্ঞে!' সৈনিক অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি চারপাশ ঘুরে দেখলাম — কোথাও কেউ নেই। 'ডজ' গাড়ির ড্রাইভার ভেড়ার চামড়ার কোটের ওপর হাতা-ছাড়া বর্ষাতি পরে হুইল চেপে ধরে ঘুমোচ্ছিল, না ঝিমোচ্ছিল ঠিক বোঝা গেল না।

আমি সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে এসে হাতড়ে হাতড়ে দরজার সন্ধান করে সামান্য খুলে ধরে বললাম:

'চলে আসুন।'

ছেলেটা আর স্যুটকেস হাতে খলিন আমার পাশ দিয়ে সুরুৎ করে গাড়ির কাছে চলে এলো, তেরপলের খসখস আওয়াজ হল, নীচু গলায় এক আধ টুকরো কথাবার্তা শোনা গেল — খলিন ড্রাইভারকে ডেকে তুলল — ইঞ্জিন স্টার্ট দিল, 'ডজ' চলতে শুরু করল।

তিন

ডিভিশনের গ্নুপ্তচর কোম্পানির প্লেটুন-কম্যান্ডার সার্জেন্ট-মেজর কাতাসনভ তিন দিন পরে আমার কাছে এসে হাজির।

তার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে, রোগা বেঁটেখাটো তার চেহারা। ম্নুখের হাঁ ছোট, ওপরের ঠোঁটটা খাটো, নাক চেপটা ধরনের, নাকের ফুটো একেবারেই ছোট, চোখদ্নুটো নীলচে ছাই-ছাই, সজীব। তার স্নুশ্রী ভদ্র চেহারার জন্য তাকে দেখায় একটা খরগোসের মতো। লোকটা বিনয়ী, শান্ত, বৈশিষ্ট্যস্নুচক কিছ্নুই নেই তার চেহারায়। কথা সে এমন আধো আধো করে বলে যে সেদিকে লোকের নজর না পড়ে যায় না — আর সেই কারণেই হয়ত বা একটু লাজ্নুক-লাজ্নুক, লোকের সামনে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। অথচ এই লোকটিই যে শত্র্নুপক্ষের 'কথা বার করার লোক' খ্নুঁজে বার করতে ওস্তাদ এবং এ ব্যাপারে আমাদের আর্মির অন্যতম সেরা লোক তা জানা না থাকলে যে কারও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। ডিভিশনে লোকে আদর করে তাকে 'কাতাসনিচ' বলত।

কাতাসনভকে দেখে আমার আবার মনে পড়ে গেল ছোট্ট বন্দারেভের কথা — এই কয়দিনের মধ্যে একাধিকবার আমার মনে হয়েছে তার কথা। আমি ঠিক করলাম স্নুযোগ পেলেই কাতাসনভকে জিজ্ঞেসবাদ করে ছেলেটা সম্পর্কে জেনে নেব — কাতাসনভ নির্ঘাত জানে, কেননা সে রাতে এই কাতাসনভই ত নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল দিকোভ্‌কার কাছে, যে জায়গাটা 'জার্মানরা এমন ছেয়ে ফেলেছে যে পাড়ের দিকে এগোনোর উপায় নেই'।

স্টাফের স্নুড়ঙ্গ-ঘরে প্রবেশ করার পর বনাতের কাপড়ের

লাল টকটকে টুপির কানাতে হাত ঠেকিয়ে সে অনুচ্চস্বরে সম্ভাষণ জানিয়ে কিট ব্যাগ না নামিয়েই দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল কখন আমি কেরানির ওপর হম্বিতম্বি শেষ করি।

কেরানিরা হালে পানি পাচ্ছে না, এদিকে আমিও তিত-বিরক্ত, রেগে আগুন হয়ে আছি — সবে টেলিফোনে মাস্‌লভের বিরক্তিকর লেকচার শুনতে হয়েছে। প্রায় রোজ সে আমাকে ফোন করে, তাও আবার ভোরবেলায়, আর সব সময় তার কাজ একটিই — আমার কাছ থেকে সে অনবরত দাবি করে সময় মাফিক রিপোর্ট, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ফর্ম আর নক্সার যত রাজ্যের খুঁটিনাটি — কখন-কখন বা সময়েরও আগে। এতে আমার মনে এমন সন্দেহও হয় যে তার হিসাব-নিকাশের একটা অংশ তার নিজের মাথা থেকে বার করা — লোকটা লেখাজোখা বড় বেশি ভালোবাসে।

তার কথাবার্তা শুনে মনে হয় এই সমস্ত কাগজপত্র যদি আমি যথাসময়ে রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে পেঁছে দিতে পারি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে আমাদের সাফল্যে। সমস্তটা যেন নির্ভর করছে আমারই ওপর। মাস্‌লভের দাবি আমি যেন এই রিপোর্ট দাখিলের দিকটায় ব্যক্তিগত ভাবে 'মন লাগাই'। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি না, আমার মনে হয় 'মন লাগিয়েই' কাজ করি, কিন্তু ব্যাটেলিয়নে সে রকম কোন সচিব নেই, কোন অভিজ্ঞ কেরানিও নেই; ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা দেরি করে ফেলি, আর প্রায় সব সময়ই দেখা যায় আমরা কিছু না কিছু একটা গোলমাল করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে বহুবার আমি ভেবে দেখেছি এই সব কেরানির কাজ করার চেয়ে যুদ্ধ করা অনেক সহজ, তাই আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি কবে
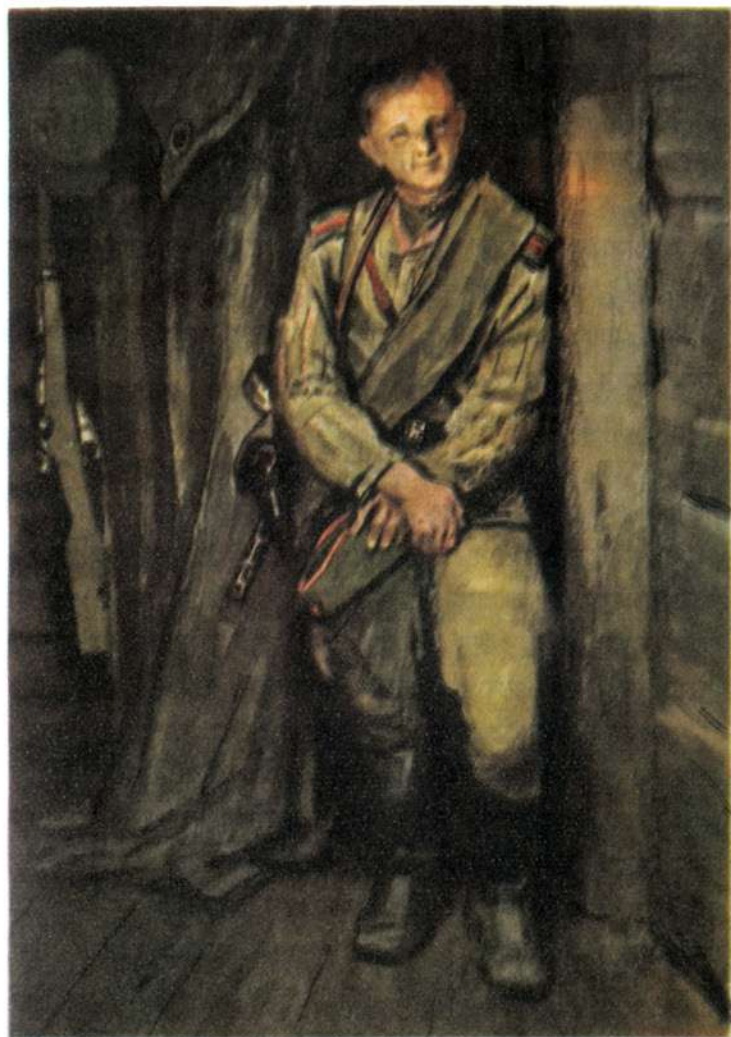
সত্যিকারের একজন ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার এসে আমার হাত থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আমি কেরানিদের গালাগাল করে যাচ্ছি, এদিকে কাতাসনভ টুপিটা হাতের মুঠোয় চেপে চুপচাপ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কি আমার কাছে?' তার দিকে ঘুরে শেষকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম — অবশ্য জিজ্ঞেস না করলেও পারতাম, যেহেতু মাস্‌লভ আগে থাকতে আমাকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে কাতাসনভ আসছে এবং আমি যেন তাকে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে যেতে দিই, সব রকম ভাবে তাকে সহায়তা করি।

'হ্যাঁ, আপনার কাছেই,' কাতাসনভ লাজুক হাসি হেসে বলল। 'জার্মানদের একবার একটু দেখতে চাই...'

'তা যাও না, দেখ গিয়ে,' গাম্ভীর্যের খাতিরে একটু থেমে প্রসন্ন সুরে আমি অনুমতি দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আর্দালিকে হুকুম দিলাম ওকে যেন ব্যাটেলিয়নের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

ঘণ্টা দুয়েক পরে, রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে বার্তা পাঠানো হয়ে গেলে আমি ব্যাটেলিয়নের রসুইঘরে খাবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য রওনা দিলাম, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ কেটে এসে পৌঁছুলাম পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে।

কাতাসনভ স্টেরিওস্কোপিক টেলিস্কোপ দিয়ে 'জার্মানদের দেখছে'। আমিও দেখলাম, যদিও সবই আমার পরিচিত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রশস্ত নীপারের জলরাশির বুকে বায়ুপ্রবাহে মৃদু তরঙ্গ উঠছে, তার ওপাড়ে দেখা যাচ্ছে শত্রুকবলিত তীরভূমি। জলের ধার বরাবর চলে গেছে সরু এক ফালি চড়া। তার ওপরে থরে থরে উঠে আছে অন্তত এক মিটার উঁচু খাঁজ, আরও দূরে এঁটেল মাটির ঢালু তীর — এখানে ওখানে ঝোপঝাড়ে ছাওয়া — রাতের বেলায় শত্রুপক্ষের আউটপোস্ট-

টহলদাররা ওখানে টহল দেয়। ঐ জায়গাটা ছাড়িয়ে আট মিটার খানেক উঁচুতে প্রায় খাড়া হয়ে উঠেছে উঁচু পাড়। খাড়া পাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে শত্রু রক্ষাব্যূহের সম্মুখভাগের ট্রেঞ্চ। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে ডিউটি দিচ্ছে মাত্র জনকতক পর্যবেক্ষক, বাদবাকিরা তাদের আশ্রয় শিবিরে বিশ্রাম করছে। রাতের দিকে জার্মানরা তাদের পরিখার এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকবে, সকাল অবধি চারদিক আলোকিত করে তোলার জন্য রকেট ছাড়বে।

ওপাড়ের ঐ বালুকাময় ফালি জমিটার ওপর, জলের ধারে পড়ে আছে পাঁচটি লাশ। সেগুলির মধ্যে তিনটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছাড়াছাড়া হয়ে, নানা ভঙ্গিতে — কোন সন্দেহ নেই যে পচন ধরেছে — আমি এক সপ্তাহের ওপরে হয়ে গেল লক্ষ করছি। আর অন্য দুটো টাটকা — খাঁজটায় পিঠ ঠেকিয়ে, আমি যেখানে আছি সেদিকে, সোজা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসানো। দু'জনের কারোরই গায়ে ওপরের কোন পোশাক নেই, পায়ে জুতো নেই। একজনের গায়ে নাবিকের ডোরাকাটা গেঞ্জি — টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'লিয়াখভ আর মরোজ,' আই-পীস থেকে চোখ না সরিয়ে কাতাসনভ বলল।

জানা গেল ওরা ছিল ওরই সাথী — ডিভিশনের গুপ্তচর কোম্পানির সার্জেণ্ট। পর্যবেক্ষণ করতে করতে সে তার মৃদু আধো আধো কণ্ঠে বলে যেতে লাগল কী করে ঘটনাটা ঘটেছিল।

...চারদিন আগে পাঁচ জন লোকের একটা স্কাউটদল শত্রুপক্ষের কথা বার করার লোককে ধরে আনার উদ্দেশ্যে নদীর ওপাড়ে যায়। তারা ভাটির টানে যাত্রা করে নদী পার হয়ে

নিঃশব্দে একজনকে বন্দীও করে ফেলে, কিন্তু ফেরার পথে জার্মানরা তাদের দেখে ফেলে। তখন ওদের তিনজন বন্দী-জার্মানটাকে নিয়ে নৌকোর দিকে পিছু হটতে থাকে — তারা সফলও হয়, কিন্তু পথে একজন মাইন ফেটে মারা যায়, আর বন্দী-জার্মানটা নৌকোয় করে নিয়ে যাবার সময় মেশিনগানের ছররায় আহত হয়। আর এই যে দু'জন — নাবিকের গেঞ্জি গায়ে লিয়াখভ আর অন্যজন হল মরোজ — এরা শুয়ে পড়ে জার্মানদের দিকে গুলি ছুঁড়ে ওদের বন্ধুদের পালানোর সুযোগ করে দেয়।

ওরা মারা যায় শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষাব্যূহের অনেকখানি ভেতরে। কিন্তু জার্মানরা ওদের গায়ের জামাকাপড় খুলে নিয়ে রাতের বেলায় নদীর কাছে টেনে নিয়ে এসে এমন ভাবে বসিয়ে দেয় যাতে এপাড় থেকে দেখতে পেয়ে আমাদের শিক্ষা হয়।

'ওখান থেকে ওদের সরিয়ে আনা দরকার,' কাতাসনভ তার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আশ্রয় শিবির থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি আমাদের খুদে বন্দারেভের কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ইভানের কথা বলছেন ত?' কাতাসনভ আমার দিকে তাকাল— দেখলাম তার মুখ অসাধারণ আন্তরিক, স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'আশ্চর্য ছেলে! তবে এত বেশি মেজাজী যে কী বলব! গতকাল ত দস্তুরমতো একচোট হয়ে গেল।'

'কী ব্যাপার?'

'আরে যুদ্ধ কি আর ওর মতো ছেলেমানুষের কাজ?.. ওকে স্কুলে পাঠাতে চায় — সুভরভ স্কুলে কম্যান্ডার হুকুম দিয়েছেন সেই রকম। কিন্তু ও গোঁ ধরে বসে আছে — কোন স্কুলে-টুলে

নয়! বারবার সেই এক কথা — যুদ্ধের পরে। বলে, এখন যুদ্ধ করব, স্কাউটিং-এ যাব।'

'কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে যদি সেরকম হুকুম এসে থাকে, তাহলে ত যুদ্ধ করার তেমন কোন সুযোগ দেখছি না।'

'হুঁ কী যে বলেন? ওকে ধরে রাখে সাধ্যি কার! প্রতিশোধ নেবার জন্যে ও টগবগ করছে... কেউ যদি না পাঠায় নিজেই যাবে। একবার ত নিজেই গেছে এরকম...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতাসনভ ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাতেই কাজের কথা মনে পড়ে যেতে বলল, 'ইশ, দেখ কাণ্ড, বকবক করতে করতে একদম খেয়াল ছিল না!' হাত দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর্টিলারি অবজার্ভেশন পোস্টে যাবার পথ কি এইটে?'

মুহূর্তের মধ্যে কায়দা করে ডালপালা ফাঁক করে সে গাছপালার নীচে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

* * *

আমাদের ব্যাটেলিয়নের এবং আমাদের ডান ধারের তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে, সেই সঙ্গে ডিভিশনের গোলন্দাজদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেও কাতাসনভ দু'দিন ধরে জার্মানদের দেখে, তার ফৌজী নোটবুকে নোট আর স্কেচ করতে লাগল। আমি রিপোর্ট পেলাম সে নাকি সারা রাত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে টেলিস্কোপের সামনে কাটিয়েছে, সকালেও দেখি সে ওখানে আছে, দিনের বেলায়, আবার সন্ধ্যাবেলায়ও — আমি ভেবে অবাক না হয়ে পারি না কখন ও ঘুমোয়?

তিন দিনের দিন সকাল বেলায় খলিন এসে হাজির। সে

হুড়মুড় করে স্টাফের সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল, হৈ হৈ করে সকলকে সম্ভাষণ জানাল। তারপর 'এই নাও ধর, বলো না যে আমি কেম্পন' — এই বলে আমার হাত ধরে এমন সাঁড়াশী-চাপ দিল যে আমার আঙুলের গাঁটগুলো মটমট করে উঠল, আমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলাম।

'তোমাকে আমার দরকার হবে,' এই বলে সে রিসিভার তুলে নিয়ে তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নে ফোন করে সেখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন রিয়াব্‌ৎসেভের সঙ্গে কথা বলল।

'...কাতাসনভ তোমার কাছে যাচ্ছে — ওকে সাহায্য করো। ও নিজেই তোমাকে সব বলবে। গরম খাবার খাইও ওকে... আচ্ছা, তারপর বলি শোন — আর্টিলারির লোকেরা কিংবা আরও কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে বলবে যে আমি বেলা একটার পরে তোমাদের হেড কোয়ার্টারে থাকব।' — এই হল খলিনের নির্দেশ। 'আর তোমাকেও আমার দরকার হবে! প্রতিরক্ষার স্কীমটা তৈরি রাখবে, তুমিও তোমার জায়গায় থেকো।'

রিয়াব্‌ৎসেভকে সে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে, যদিও রিয়াব্‌ৎসেভ বয়সে তার চেয়ে বছর দশেকের বড়। রিয়াব্‌ৎসেভের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গেও সে এমন ব্যবহার করে যেন সে আমাদের ওপরওয়ালা, অথচ আমাদের কারোরই ওপরওয়ালা সে নয়। ওর স্বভাবটাই এরকম — এমনকি ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে অফিসারদের সঙ্গে এবং আমাদের রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সঙ্গেও সে এই ভাবেই কথাবার্তা বলে। এটা অবশ্য ঠিক যে আমাদের সকলের কাছে সে ঊর্ধ্বতন স্টাফের একজন প্রতিনিধি, কিন্তু সেটাই সব নয়। সামরিক বাহিনীর আরও বহু গুপ্তচর অফিসারের মতো তাকেও দেখলে বোঝা যায়, সেনাবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপের মধ্যে স্কাউটিং-এর কাজ যে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এই কারণে সকলেরই কর্তব্য যে তাকে সাহায্য করা — এতে যেন তার কোন সন্দেহ নেই।

এবারেও রিসিভার নামিয়ে রাখার পর, আমি অন্য কোন কাজের উদ্যোগ করছি কিনা, হেড কোয়ার্টারে আমার কোন কাজ আছে কিনা জিজ্ঞেস না করেই হুকুমের সুরে সে আমাকে বলল, 'প্রতিরক্ষার স্কীমটা সঙ্গে নাও, চল তোমার সৈন্যদলের হালচালটা একবার দেখে আসি।'

ওর এই মাতব্বরী আমার আদৌ ভালো লাগে না, কিন্তু স্কাউটদের কাছ থেকে ওর সম্পর্কে, ওর নির্ভীকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পর্কে অনেক কথা শোনার পর আমি আর কিছু বলি না, ওকে যে ভাবে ক্ষমা করে দিই অন্য আর কাউকে তা করতাম না। তেমন কোন জরুরী কাজ আমার হাতের কাছে

ছিল না, তবু আমি ইচ্ছে করে জানালাম যে হেড কোয়ার্টারে খানিকটা দেরি হবে। একথা শোনার পর সে গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করবে — এই বলে সুড়ঙ্গ-ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারের দৈনন্দিন হুকুম ও নির্দেশের ফাইল ও রাইফেল কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। গুপ্তচর দপ্তরের ক্যানভাস-ঢাকা 'ডজ' গাড়িটা কিছু দূরে কতকগুলো ফারগাছের নীচে অপেক্ষা করছে। টমিগান ঘাড়ে নিয়ে একপাশে গাড়ির ড্রাইভার পায়চারী করছে। হুইলের ওপরে বড় স্কেলের একটা ম্যাপ বিছিয়ে তার সামনে খলিন বসে আছে; পাশে কাতাসনভ — তার হাতে প্রতিরক্ষার স্কীম। ওরা কথাবার্তা বলছিল, আমি এগিয়ে আসতে কথা থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে মাথা ঘোরাল। কাতাসনভ ব্যস্তসমস্ত হয়ে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তার অভ্যস্ত লাজুক হাসি হেসে আমাকে সম্ভাষণ জানাল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' ম্যাপ আর স্কীম গুটিয়ে রেখে নেমে আসতে আসতে খলিন তাকে বলল। 'সব কিছু ভালো করে দেখুন, বিশ্রাম করুন। ঘণ্টা দু-তিন বাদে আমি আসছি।'

ফ্রণ্ট লাইনে যাবার অনেকগুলি পথ আছে, তারই একটার ভেতর দিয়ে আমি খলিনকে নিয়ে যাই। 'ডজ' গাড়িটা তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের দিকে সরে যায়। খলিন বেশ খোশমেজাজে আছে, আনন্দে শিস দিতে দিতে চলেছে। দিনটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, চারদিক নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে যুদ্ধের কথা প্রায় ভুলেই যেতে হয়। অথচ যুদ্ধ চলছে — আমাদের ঠিক সামনে: বনের শেষ প্রান্ত বরাবর চলে গেছে সদ্য খোঁড়া পরিখা, বাঁ দিকে নেমে গেছে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চের প্যাসেজ — ঘাসের চাপড়া আর ঝোপঝাড় দিয়ে ওপরটা ঢাকা, সযত্নে আড়াল-করে-রাখা দস্তুরমতো একটা

ট্রেঞ্চ সোজা চলে গেছে তীরের দিকে। এক শ' মিটারেরও বেশি তার দৈর্ঘ্য।

ব্যাটেলিয়নে কর্মি-সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় রাত্রিতে এমন একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়া — তাও আবার একটিমাত্র কোম্পানির লোকবলে — খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। খলিন আমাদের কাজের কদর দেবে এই আশায় আমি তাকে সে কথা বললাম, কিন্তু সে চার ধারে এক ঝলক দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জানতে চাইল ব্যাটেলিয়নের মূল এবং সাহায্যকারী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি কোথায় কোথায় আছে। আমি দেখালাম।

'ওঃ কী নিঝুম!' একটু অবাক হয়েই সে মন্তব্য করল, তারপর বনের শেষ প্রান্তের ঝোপঝাড়ের আড়ালে পজিশন নিয়ে ফৌজী বাইনোকুলর দিয়ে নীপার আর তার উপকূলভাগ নিরীক্ষণ করতে লাগল — এখানকার এই ছোট টিলাটার ওপর থেকে ওপাড়ের সব কিছু কর-রেখার মতো স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমার 'সৈন্যদলের' হালচালে কিন্তু তার তেমন কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হল না।

দেখছে ত দেখছেই, এদিকে আমি ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি — কোন কাজ করার নেই আমার। হঠাৎ বন্দারেভের কথা মনে পড়ে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, সেই যে ছেলেটা, যে আমার কাছে সেদিন ছিল, কে সে? কোথা থেকে?'

'ছেলেটা?' খলিনের মন তখন অন্য কোথাও পড়ে ছিল — তাই সে কথাটা আউড়ে বলল, 'ও, সেই ইভান!.. থাক আর বেশি জেনে কাজ নেই — চুলে পাক ধরবে,' রসিকতা করে পরে আমাকে বলল, 'আচ্ছা, এবারে এসো দেখি তোমার সুড়ঙ্গ-পথটা পরখ করে দেখা যাক!'

ট্রেঞ্চের ভেতরটা অন্ধকার। কোথাও কোথাও আলোর জন্য ফাঁক রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো ডালপালা দিয়ে ঢাকা। আমরা প্রায় ঘাড় গুঁজে আধা-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলতে থাকি — মনে হয় এই স্যাঁতসেঁতে কালো গহ্বরের বুঝি কোন শেষ নেই। কিন্তু দেখতে দেখতে সামনে আলো ফুটে উঠল, আরও একটু এগিয়ে যেতে আমরা এসে পৌঁছুলাম নীপারের বিশ গজের মধ্যে, যুদ্ধের আউটপোস্ট ট্রেঞ্চে।

স্কোয়াডের কম্যান্ডে যে অল্পবয়সী সার্জেন্টটি ছিল সে বিশালবক্ষ, রাশভারী চেহারার খলিনের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে আমার কাছে রিপোর্ট করল।

নদীর তীর বালিতে ভরা হলে কী হবে, ট্রেঞ্চের ভেতরে এক হাঁটু জলকাদা — এর কারণ সম্ভবত এই যে ট্রেঞ্চের তলাটা নদীর জল-সীমানার নীচে।

আমি জানি যে খলিন যখন খোশমেজাজে থাকে তখন কথা বলতে আর বাচালতা করতে তার বেশ উৎসাহ দেখা যায়। এখনও সে তা-ই করল — এক প্যাকেট সিগারেট বার করে আমাকে এবং সৈন্যদেরও ধূমপানে আপ্যায়িত করল। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল:

'বাঃ, দিব্যি জীবন কাটছে তোমাদের! যুদ্ধ চলছে, অথচ তার কোন চিহ্নই নেই। নির্ঝঞ্ঝাট — স্বর্গসুখ যাকে বলে আর কি!'

'হ্যাঁ, হাওয়া বদলের জায়গা,' মুখ গোমড়া করে বলল মেশিনগান চালক চুপাখিন। কোলকুঁজো গড়নের লিকলিকে এই সৈন্যটার পরনে ছিল তুলোর কোর্তা আর প্যান্ট। মাথা থেকে হেলমেট খুলে কোদালের হ্যান্ডেলের ওপর সেটা বসিয়ে সে ট্রেঞ্চের প্রাচীরের মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরল। কয়েক সেকেন্ড

যেতে না যেতেই ওপাড় থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল — গুলি মৃদু শিস দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

'স্নাইপার?' খলিন জিজ্ঞেস করল।

'বললাম না, হাওয়া বদলের জায়গা,' গম্ভীর স্বরে চুপাখিন আওড়াল। 'আমাদের পরমাত্মীয়দের চোখের সামনে জলকাদার ধারাস্নান...'

ঐ একই অন্ধকার ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে আমরা ফিরে চললাম পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দিকে। জার্মানরা যে হুঁশিয়ার হয়ে আমাদের সামনের লাইনের ওপর নজর রাখছে এই ব্যাপারটা খলিনের ভালো লাগল না। প্রতিপক্ষ যে সজাগ থাকবে এবং সর্বক্ষণ আমাদের ওপর নজর রাখবে এটা যদিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তবু খলিন হঠাৎই গম্ভীর ও চুপচাপ হয়ে গেল।

পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে আসার পর সে টেলিস্কোপ দিয়ে মিনিট দশেক ধরে নদীর দক্ষিণ তীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, পর্যবেক্ষণের ভার যাদের ওপর ছিল তাদের গোটা কয়েক প্রশ্ন করল, তাদের লগ-বুকের পাতা উলটে-পালটে দেখে এই বলে গালাগাল করল যে তারা কিছু জানে না, লগ-বুকে তারা যা লিখেছে তা নেহাৎই সামান্য, তা থেকে প্রতিপক্ষের দৈনন্দিন ব্যবস্থা ও হালচাল সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। আমি অবশ্য তার এই অভিযোগ মেনে নিতে পারলাম না, কিন্তু আমি কোন কথা বললাম না।

'ঐ যে ওখানে গেঞ্জি-গায়ে যাদের লাশ দেখলে তারা কে, জান?' ওপাড়ে স্কাউটদের যে লাশগুলো পড়ে ছিল সেই প্রসঙ্গে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'জানি।'

'তা তুমি বলতে চাও, ওদের ওখান থেকে সরিয়ে আনতে পার

না?' অবজ্ঞাভরে অসন্তুষ্ট স্বরে সে বলল। 'এক ঘণ্টার কাজ। কখন ওপর থেকে নির্দেশ আসবে সেই আশায় বসে আছ বুঝি?'

আশ্রয় শিবির থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'তুমি আর কাতাসনভ অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ? আচমকা হানা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছ নাকি?'

'বিশদ জানানো হবে নোটিশে!' আমার দিকে না তাকিয়ে গোমড়া মুখে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে খলিন ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের দিকে চলল।

আমি কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করে তাকে অনুসরণ করলাম।

'তোমাকে আমার আর দরকার নেই,' ঘাড় না ফিরিয়েই হঠাৎ সে আমাকে জানাল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম, হতভম্ব হয়ে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর পিছন ফিরে রওনা দিলাম হেড কোয়ার্টারের দিকে ।

'আচ্ছা, রোসো!..' খলিনের এই অশিষ্টতায় বিরক্ত হয়ে আমি মনে মনে বললাম। আমি অপমানিত বোধ করলাম, রাগে বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে লাগলাম। একজন সৈন্য আমাকে স্যালুট করে পাশ দিয়ে যেতে যেতে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

এদিকে হেড কোয়ার্টারে কেরানি জানাল:

'মেজর দু'বার ফোন করেছিলেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন...'

আমি রেজিমেণ্টের কম্যান্ডারকে ফোন করলাম।

'তোমার ওখানকার খবর-টবর কী?' রেজিমেণ্ট-কম্যান্ডার তার

মৃদুমন্দ, শান্ত স্বরে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'সব স্বাভাবিক, কমরেড মেজর।'

'খলিন তোমার এখানে আসছে... যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করো, ওকে সব রকমে সাহায্য করো।'

'জাহান্নামে যাক খলিনটা!' আমি মনে মনে বললাম।

মেজর কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে যোগ করল:

'এটা 'ভোল্গার' হুকুম। আমাকে একশ' এক নম্বর ফোন করেছিল!'

'ভোল্গা' হল আর্মির হেড্ কোয়ার্টার, আর একশ' এক নম্বর — আমাদের ডিভিশনের কম্যান্ডার কর্ণেল ভরনোভ। 'বয়েই গেল।' আমি ভাবলাম। 'তাই বলে খলিনের পেছন পেছন ছোটা আমার দ্বারা হবে না! যা বলবে তা করব ঠিকই, কিন্তু পেছন পেছন ঘুরঘুর করে বেড়ান, গদগদ ভাব দেখানো — মাফ করবেন — ওটি হচ্ছে না!'

আমি তাই খলিনের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বিকেলের দিকে আমি ব্যাটেলিয়নের মেডিক্যাল এইড পোস্টে গেলাম। তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের পাশে, লাইনের ডান ধারে দুটো প্রশস্ত আশ্রয় শিবিরে তার স্থান হয়েছে। এই ব্যবস্থা রীতিমতো অসুবিধাজনক, কিন্তু ব্যাপারটা এই যে আমরা যে-সমস্ত সুড়ঙ্গ-ঘরে ও আশ্রয় শিবিরে আছি সেগুলো সবই জার্মানদের খোঁড়া, সেখানকার যাবতীয় ব্যবস্থাও তাদের করা — তাই বলাই বাহুল্য, আমাদের কথা তারা আদৌ ভাবে নি।

নতুন মেডিক্যাল অফিসার একটি মেয়ে। দিন দশেক হল ব্যাটেলিয়নে এসেছে। চমৎকার দেহের গড়ন, বছর বিশেক বয়স,

দেখতে সুন্দর, মাথার চুল বাদামী, উজ্জ্বল নীল চোখ। গজ-কাপড় দিয়ে রুমালের মতন করে মাথার ফাঁপানো চুল গোছানো। আমাকে দেখে হকচকিয়ে গিয়ে মাথার সেই ফেটিতেই হাত ঠেকিয়ে স্যালুট ঠুকে রিপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। সে যা বলল তাকে রিপোর্ট না বলে অসংলগ্ন, সলজ্জ কিছু বিড়বিড়ানিই বলা চলে। আমি অবশ্য কিছু বললাম না। ওর পূর্বসূরী — বৃদ্ধ আর্মির মেডিক্যাল কর্মী সিনিয়র লেফটেনাণ্ট ভস্ত্রিকোভ ছিলেন হাঁপানি রোগী — লড়াইয়ের ময়দানে সপ্তাহ দুয়েক আগে তিনি নিহত হন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ, সাহসী, বেশ চটপটে। কিন্তু এই মেয়েটি?.. এখন অবধি সন্তুষ্ট হতে পারছি না।

মেয়েটি আমার দেশোয়ালি বটে — সেও মস্কো থেকে। কিন্তু যুদ্ধ বলে কথা! এখানে কোন খাতির চলে না। আমি ব্যাটেলিয়ন

কম্যান্ডারের দায়িত্ব পালন করছি, আর সে আমার কাছে স্রেফ একজন মেডিক্যাল অফিসার — এর বেশি কিছু নয়। তাও আবার নিজের কাজ ঠিক সামলে উঠতে পারছে না।

আমি তাই অপ্রসন্ন স্বরে তাকে বলি যে কোম্পানিগুলিতে ফের উকুনের উৎপাত দেখা দিয়েছে, কাপড়চোপড় ঠিকমতো রোদে দেওয়া হচ্ছে না, এখন পর্যন্ত কর্মীদের গা-হাত-পা ধোয়ার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নি। তার বিরুদ্ধে আরও বেশ কতকগুলো অভিযোগ এনে শেষকালে আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে, যেহেতু সে একজন কম্যান্ডিং অফিসার তাই সব কাজ তাকে নিজের হাতে করতে হবে না — কোম্পানীর স্ট্রেচার-বাহক আর মেডিক্যাল আর্দালিদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে।

সে দু'হাত টান করে মাথা নীচু করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কাঁপা কাঁপা মৃদু গলায় অবিরাম বলে চলল, 'যে আজ্ঞে... যে আজ্ঞে... যে আজ্ঞে,' আমাকে আশ্বাস দিল যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, আশা করছে যে অচিরেই 'সব ঠিক হয়ে যাবে'।

বেচারির চেহারা তখন এত করুণ যে তার জন্য আমার দুঃখ হতে লাগল। কিন্তু আমাকে এরকম উপলব্ধির প্রশ্রয় দিলে চলবে না — ওকে করুণা করার কোন অধিকার আমার নেই। আমরা যদি প্রতিরক্ষার অবস্থায় থাকতাম, তাহলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু সামনেই শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষা ভেঙে নীপার বেরোবার কাজ — কঠিন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ — ব্যাটেলিয়নে অনেক লোক আহত হবে, তাদের জীবন অনেকাংশে নির্ভর করবে এই মেয়েটির ওপর, যার ইউনিফর্মের কাঁধে আছে মেডিক্যাল সার্ভিস লেফটেনান্টের কাঁধ-পটি।

অস্বস্তিকর চিন্তা নিয়ে আমি সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতর থেকে

বেরিয়ে আসি, মেডিক্যাল অফিসারও বেরিয়ে আসে আমার পিছন-পিছন।

আমাদের এখান থেকে একশ' পা খানেক দূরে ডান দিকে একটা ঢিবি — তার ওপর ডিভিশনের গোলন্দাজদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ঢিবির পায়ের কাছে, ফ্রন্ট লাইনের পেছন দিকে — একদল অফিসার। তাদের মধ্যে আছে খলিন, রিয়াব্‌ৎসেভ, গোলন্দাজ রেজিমেন্ট থেকে আমার পরিচিত কয়েকজন ব্যাটারি-কম্যান্ডার, তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের মর্টার কোম্পানির কম্যান্ডিং অফিসার; এছাড়া আছে আমার অপরিচিত আরও দু'জন অফিসার। খলিন এবং আরও দু'জনের হাতে ছিল ম্যাপ অথবা স্কীম। আমি তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম যে ওরা আচমকা হানা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে সেটা হবে তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের এলাকায়।

আমাদের দেখতে পেয়ে অফিসাররা ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকায়। রিয়াব্‌ৎসেভ, গোলন্দাজ রেজিমেন্টের লোকেরা আর মর্টারম্যান আমাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাল, জবাবে আমিও হাত নাড়লাম। আমি আশা করেছিলাম যে খলিন সাড়া দেবে, আমাকে ডাকবে, যেহেতু আমার উচিত 'ওকে সব রকমে সাহায্য করা'। কিন্তু ও আমার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ম্যাপে অফিসারদের কী যেন সব দেখাচ্ছে।

আমি মেডিক্যাল-অফিসারের দিকে ফিরে বললাম:

'আপনাকে দু'দিন সময় দিচ্ছি। দু'দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে আমাকে রিপোর্ট দেবেন।'

সে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। আমি শুকনোভাবে স্যালুট ঠুকে সরে গেলাম, মনে মনে ঠিক করলাম প্রথম সুযোগেই ওকে এখান থেকে অন্য কোথাও সরাতে হবে।

অন্য কোন মেডিক্যাল অফিসারকে ওরা পাঠাক। অবশ্যই পুরুষমানুষ হওয়া চাই।

বিকেলটা কোম্পানিতে-কোম্পানিতে কাটাই — সুড়ঙ্গ-ঘর আর আশ্রয় শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি, অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করি, ব্যাটেলিয়ন এইড পোস্ট থেকে যে সব সৈন্য ফিরে এসেছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তাদের সঙ্গে এক হাত ঘুঁটি খেলি।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আমি আমার সুড়ঙ্গ-ঘরে ফিরে আসি। সেখানে এসে দেখি খলিন। সে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ফিল্ড-শার্ট আর ট্রাউজার পরা অবস্থায় দিব্যি ঘুমোচ্ছে। টেবিলের ওপর একটা চিরকুট — তাতে লেখা আছে 'সন্ধ্যা ৬·৩০-এ জাগিয়ে দিও। খলিন।'

আমি একেবারে ঠিক সময়টাতে এসে পৌঁছেছি, তাই ওকে জাগিয়ে দিলাম। চোখ খুলে সে উঠে বসল, হাই তুলল, গা মোড়ামুড়ি করল।

খলিন নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করতে করতে চারদিকে জল ছিটিয়ে হাত মুখ ধুতে ধুতে বলল, 'যাই বল বাপু, তোয়ালেটা তোমার বড্ড নোংরা। মেয়েটা ধুলেও ত পারত। কোন রকম শৃঙ্খলা নেই দেখছি।'

'নোংরা' তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার পর সে জানতে চাইল: 'আমার কথা কেউ কি জিজ্ঞেস করেছিল?'

'জানি না, আমি ছিলাম না।'

'তোমাকে কেউ ফোন করে নি?'

'বেলা বারোটা নাগাদ ফোন করেছিল, রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার।'

'কী বলল?'

'আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন সব রকমে তোমাকে সাহায্য করি।'

'তোমাকে 'অনুরোধ করল'? বোঝ কাণ্ড!' খলিন বাঁকা হাসি হাসল। 'তোমাদের ব্যবস্থা বেশ ভালোই দেখছি!' সে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ ভরা দৃষ্টি হানল আমার দিকে। 'ওঃ কী আমার মাথা রে! — আবার দুটো কানও আছে! তোমার কাছ থেকে আবার সাহায্য! কী সাহায্য হতে পারে, অ্যাঁ?'

সিগারেট ধরিয়ে সে সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু শিগগিরই আবার ফিরে এলো, তৃপ্তিভরে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে জানাল:

'ওঃ রাতটা যা হবে! — ঠিক যেন ফরমাস দেয়া!.. যা-ই বল না কেন, ঈশ্বর করুণাময়। আচ্ছা, ভগবানে বিশ্বাস কর তুমি? — বলই না... আরে, কী হল? চললে কোথায়?' কঠোর স্বরে সে জিজ্ঞেস করল। 'না, না, তুমি গেলে চলবে না। তোমাকে এখনও দরকার হতে পারে।'

বাঙ্কের ওপর বসে পড়ে সে ঘুরে ফিরে একই কথা আউড়ে অন্যমনস্ক ভাবে গান ধরল:

নিশুতি আঁধার বড়,
ভয়ে আমি জড়সড়।
নিয়ে চল ঘরে মোরে
প্রাণসখা, হাত ধরে।

আমি চার নম্বর কোম্পানির কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম। রিসিভারটা নামিয়ে রাখছি, এমন সময় কানে এলো গাড়ির শব্দ — একটা গাড়ি যেন এখানেই এসে থামল। দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

'ভেতরে আসুন!'

কাতাসনভ ভেতরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, টুপিতে আঙুল ঠেকিয়ে রিপোর্ট দিল:

'আমরা এসে গেছি কমরেড ক্যাপ্টেন।'

'সান্ত্রীকে সরিয়ে দাও!' গান থামিয়ে দিয়ে চটপট উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে খলিন বলল।

আমরা কাতাসনভকে অনুসরণ করে বাইরে এলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে ক্যানভাস-ঢাকা সেই পরিচিত গাড়িটা। সান্ত্রী যতক্ষণ না অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করার পর খলিন গাড়ির পেছনের ক্যানভাসের দড়ি খুলে ফিসফিস করে ডাকল, 'ইভান!'

'এই যে,' ছাউনির ভেতর থেকে শোনা গেল শিশু কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের মধ্যে তলা থেকে একটা ছোট্ট মূর্তির আবির্ভাব ঘটল, মূর্তিটা লাফিয়ে মাটিতে নামল।

চার

'নমস্কার!' আমরা সুড়ঙ্গ-ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ছেলেটি আমাকে বলল এবং হঠাৎ অমায়িক হাসি হেসে করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

তাকে দেখাচ্ছিল বেশ তাজা, সুস্থ; গালে গোলাপী আভা লেগেছে। কাতাসনভ ওর ভেড়ার চামড়ার কোট থেকে খড়ের কুটো ঝেড়ে দিল, খলিন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে চাও ত বল।'

'না না, সারাটা দিন ত ঘুমোলাম — আবার বিশ্রাম?'

'তাহলে আমাদের মনে ধরার মতো কিছু একটা বার কর

হে,' খলিন আমাকে বলল, 'কোন পত্রিকা-টত্রিকা বা ঐ রকম কিছু... তবে ছবি থাকা চাই।'

কাতাসনভ ছেলেটাকে তার গায়ের কোট খুলতে সাহায্য করল, আমি টেবিলের ওপর 'অগনিওক' ও সচিত্র ফৌজী পত্রিকার কতকগুলি সংখ্যা রাখলাম। দেখা গেল কতকগুলি পত্রিকা ছেলেটা এর আগেই দেখেছে — সেগুলি সে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

আজ আর তাকে চেনা যায় না — দিব্যি কথাবার্তা বলছে, থেকে থেকে হাসছে, আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, খলিন ও কাতাসনভকে যেমন, তেমনি আমাকেও 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। এই সাদাটে চুলের ছেলেটার ওপর আমারও যেন কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। আমার কাছে এক বাক্স ফলের লজেন্স আছে মনে পড়ে যেতে আমি বাক্সটা খুলে ওর সামনে রাখলাম, একটা মগের মধ্যে চকোলেট রঙের ফেনা সমেত ঘন দই ঢাললাম, তার পর পাশাপাশি বসে আমরা একসঙ্গে পত্রিকা দেখতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে খলিন আর কাতাসনভ গাড়ি থেকে নিয়ে এলো জার্মানদের কাছ থেকে হাতানো আমার সেই পূর্বপরিচিত স্যুটকেসটি, সেই সঙ্গে হাতা-ছাড়া বর্ষাতির ভেতরে বাঁধা একটা বেশ বড়সড় পোঁটলা, দুটো টমিগান আর প্লাইউডের একটা ছোট স্যুটকেস।

পোঁটলাটা বাঙ্কের নীচে গুঁজে দিয়ে ওরা দু'জন আমাদের পেছনে গিয়ে বসল। আমি শুনতে পেলাম খলিন নীচু গলায় আমার সম্পর্কে বলছে:

'তুমি যদি শুনতে কী রকম চোস্ত জার্মান ঝাড়ে — এক্কেবারে জার্মানের মতন! গত বসন্তকালে আমি ওকে দোভাষী হিশেবে

কাজে লাগাব ভেবেছিলাম, অথচ দেখ, ইতিমধ্যে ও ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার হয়ে বসে আছে।'

ঘটনাটা তা-ই বটে। এক সময় ডিভিশন কম্যাণ্ডারের আদেশে আমি যে ভাবে জার্মান বন্দীদের জেরা করি তা শোনার পর খলিন আর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্‌নভ আমাকে গুপ্তচর দপ্তরের দোভাষী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আমার সে রকম কোন ইচ্ছে ছিল না, আর ঐ কাজ যে আমি নিই নি সেজন্য আমার কোন আক্ষেপও নেই। স্কাউটিং-এর কাজে আমি যেতে খুব রাজি, কিন্তু অপারেশনের কাজে, দোভাষী হিশেবে আদৌ নয়।

কাতাসনভ চুল্লীর ভেতরে লাকড়ি খুঁচিয়ে ঠিকঠাক করতে করতে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আহা বাইরে কী চমৎকার রাত!'

সে আর খলিন নীচু গলায় ফিসফিস করে তাদের সামনে যে কাজ আছে তাই নিয়ে আলোচনা করছে। ওদের কথাবার্তা থেকে আমি জানতে পারলাম যে ওরা মোটেই কোথাও আচমকা হানা দেবার কোন উদ্যোগ করছে না। আমার কাছে যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে তা হল এই যে আজ রাতে খলিন আর কাতাসনভ ছেলেটাকে নীপারের ওপাড়ে জার্মান ব্যূহের পেছনে চালান করার আয়োজন করছে। এই উদ্দেশ্যে ওরা রবারের ছোট একটা ফোলানো নৌকো সঙ্গে করে এনেছে, তা সত্ত্বেও কাতাসনভ আমার ব্যাটেলিয়ন থেকে চেপটা-তলা নৌকোটা নেওয়ার জন্য খলিনকে পীড়াপীড়ি করছে। 'খাসা ডিঙি কিন্তু,' তাকে ফিসফিস করে বলতে শোনা গেল।

'হুঃ, ঠিক টের পেয়েছে শয়তানগুলো!' আমি মনে মনে বললাম। ব্যাটেলিয়নে সবেধন পাঁচটা মাছ-ধরা ডিঙি — আজ তিন মাস হল ওগুলোকে আমরা সঙ্গে করে বয়ে বেড়াচ্ছি। শুধু

তাই নয়, অন্যান্য ব্যাটেলিয়নে একটি করে নৌকো আছে বলে তারা যাতে ওগুলো দখল করে না ফেলে সেই উদ্দেশ্যে আমি সযত্নে কামুফ্লেজ করে রাখার হুকুম দিয়ে রেখেছিলাম; বলা ছিল মার্চের সময় যেন খড়ের গাদার নীচে রাখা হয়। আর নদী পারাপারে সহায়তার উপযোগী কী কী জিনিস আছে সেই হিসাব দাখিল করার সময় পাঁচটা নৌকোর উল্লেখ না করে উল্লেখ করতাম মোটে দুটোর।

ছেলেটা লেবেণ্ডুস খেতে খেতে পত্রিকা দেখছে। খলিন আর কাত্তাসনভের কথাবার্তায় ও কান দিচ্ছে না। একটা সংখ্যায় স্কাউটদের সম্পর্কে একটা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাগুলি দেখা হয়ে গেলে ঐ সংখ্যাটা আলাদা করে সরিয়ে রেখে সে আমাকে বলল:

'এই এটা আমি পড়ব... আচ্ছা, শোন, তোমার গ্রামোফোন নেই?'

'আছে, কিন্তু স্প্রিং কেটে গেছে।'

'গরিবদের মতো জীবন কাটাচ্ছ দেখছি,' সে মন্তব্য করল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কান নাড়াতে পার?'

'কান?.. না পারি না,' আমি মৃদু হেসে বললাম। 'কেন, কী হয়েছে?'

'খলিন পারে!' অনেকটা যেন জাঁক করেই সে বলল। খলিনের দিকে ফিরে সে বলল, 'খলিন, কান নাড়িয়ে দেখাও না!'

'এই কথা! — তা যখন বলবে!' খলিন জায়গা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এই কথা বলে সাগ্রহে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সে তার মুখের মাংসপেশী সম্পূর্ণ স্থির রেখে কানের খোলটা নাড়াতে লাগল।

ছেলেটা মজা পেয়ে উল্লসিত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

'এর জন্যে আক্ষেপ করার কোন কারণ নেই,' খলিন আমাকে বলল। 'কান কী করে নাড়াতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। সে সময় পাওয়া যাবে'খন। আপাতত চল, নৌকো দেখাবে আমাদের।'

'তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবে ত?' ঝোঁকের মাথায় কথাটা জিজ্ঞেস করে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

'সঙ্গে? কোথায়?'

'ওপাড়ে।'

'দেখলে মজাটা!' ঘাড় নেড়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে খলিন বলল। 'মস্ত শিকারী দেখছি! ওপাড়ে তোমার কী দরকার?' তারপর যেন আমার গুণাগুণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলি, সাঁতারটা অন্তত জানা আছে কি?'

'তা একটু আধটু জানা আছে বৈ কি! সাঁতার কাটতে পারি, বৈঠাও বাইতে জানি।'

'সাঁতার কী রকম কাট? — ওপর থেকে নীচে? না, খাড়া ভাবে?' রীতিমতো গম্ভীর ভাব করে খলিন জানতে চাইল।

'তা আমার ত মনে হয় তোমার চেয়ে কোন অংশে খারাপ না।'

'আরও পরিষ্কার করে বল। নীপার সাঁতরে পার হতে পার?'

'বার পাঁচেক।' গরমকালে হালকা কাপড় পরে সাঁতার কাটার কথা মনে রেখে আমি কথাটা বলেছিলাম। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এর মধ্যে কোন মিথ্যে নেই। আমি তাই অম্লানবদনে বললাম, 'বার পাঁচেক এপাড়-ওপাড় করতে পারি — অনায়াসে পারি।'

'ওঃ, মরদের জোর আছে ত!' এই বলে খলিন আচমকা হো-হো করে হেসে উঠল — ওরা তিনজনেই হাসতে লাগল। আরও

সঠিক করে বলতে গেলে, হাসছিল খলিন ও ছেলেটা, কাতাসনভ হাসছিল লাজুক হাসি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে খলিন জিজ্ঞেস করল:

'আর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে খেলার অভ্যেস আছে ত?'

'চুলোয় যা!..' প্রশ্নের ভেতরে যে খোঁচা আছে তা টের পেয়ে আমি খাপ্পা হয়ে উঠলাম।

'দেখলে ত,' আমাকে দেখিয়ে খলিন বলল, 'অর্ধেক স্প্রিং ঘোরাতে না ঘোরাতে ছুটল একেবারে পুরোদমে! এতটুকু ধৈর্য নেই! নার্ভগুলো যে একেবারে ছেঁড়া ন্যাতার মতো — অথচ ওপাড়ে যাবার জন্যে বায়না ধরেছে কেমন দেখ। না হে ছোকরা, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ভালো!'

'তাহলে নৌকোও দিচ্ছি নে।'

'আরে, নৌকো আমরা নিজেরাই নেব — আমাদের হাত নেই নাকি? তাছাড়া সেরকম দেখলে ডিভিশনের কম্যান্ডারকে ফোন করব, সুরসুর করে নিজের ঘাড়ে করে এনে নদীর ঘাটে নামিয়ে দেবে!'

'আহা, হয়েছে,' ছেলেটা আপসের সুরে সালিসি করে বলল। 'অমনিতেই দেবে আমাদের। ...তাই না? দেবে ত?' আমার চোখের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি অগত্যা আর কোন উপায় নেই,' মুখে হাসি টেনে আমাকে বলতে হল।

'তাহলে চল দেখা যাক!' আমার আস্তিন ধরে খলিন বলল। তারপর ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি ততক্ষণ এখানেই থাক। তবে হ্যাঁ, ছটফট করে বেড়িও না, বিশ্রাম কর।'

কাতাসনভ টুলের ওপর প্লাইউডের সুটকেস রেখে সেটা খুলল। সুটকেসের ভেতরে দেখা গেল নানা রকমের যন্ত্রপাতি,

কিসের যেন কতকগুলো কৌটো, নেকড়া, ফেঁসো আর ব্যাণ্ডেজ। আমি আমার তুলোর কোর্তাটা গায়ে চড়ানোর আগে কারুকাজ করা হাতলওয়ালা ছুরি বেল্টে গুঁজলাম।

'উঃ, কী ছুরি!' ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে লাগল। 'দেখাও না একবার!'

আমি ছুরিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর আমাকে অনুনয় করে বলল, 'ছুরিটা দাও না, অ্যাঁ!'

'দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বুঝলে কিনা... এটা একজনের দেয়া একটা উপহার।'

আমি ওকে ঠকানোর জন্য বলি নি। এই ছুরিটা বাস্তবিকই একটা উপহার, আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কন্স্তান্তিন খলদোভের স্মৃতিচিহ্ন। ক্লাস থ্রি থেকে আমরা দুজনে একই ডেস্কে বসতাম, একই সঙ্গে আমরা আর্মিতে যাই, একই মিলিটারী স্কুলে ছিলাম, একই ডিভিশনে, পরে একই রেজিমেণ্টে আমরা যুদ্ধও করি।

সেপ্টেম্বরের সেই দিন সূর্যোদয়ের সময় আমি ছিলাম দেস্না নদীর তীরে এক ট্রেঞ্চের ভেতরে। আমি দেখতে পেলাম কোস্তিয়া তার কোম্পানি নিয়ে নদী পার হয়ে দক্ষিণ তীরে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে — আমাদের ডিভিশনের মধ্যে ওরাই প্রথম একাজ করছে। কাঠের গুঁড়ি, লকড়ি আর পিপে বেঁধে তৈরি ভেলাগুলি যখন নদীর মাঝামাঝি চলে গেছে সেই সময় জার্মানরা ফেরির ওপর গোলা আর মর্টার বর্ষণ করতে লাগল। তক্ষুনি জলের একটা সাদা ফোয়ারা কন্স্তান্তিনের ভেলার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম। তারপর যে কী হল আর দেখতে পেলাম না — টেলিফোনিস্টের হাতের রিসিভার ভাঙা আওয়াজ তুলে বলল, 'গাল্ৎসেভ আগে বাড়!..' সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং

আমার পিছু পিছু গোটা কোম্পানি — একশ' জনেরও বেশি লোক — ট্রেঞ্চের সামনের মাটির ঢিবি লাফিয়ে পার হয়ে ছুটলাম জলের দিকে, যেখানে ছিল ঠিক ঐ রকমই আরও কতকগুলো ভেলা... আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা দক্ষিণ তীরে হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিয়ে দিলাম।

ছুরিটা আমি নিজের কাছে রেখে দেব, না যুদ্ধের পর মস্কোয় ফিরে আর্বাত এলাকায় সেই শান্ত নির্জন গলির ওপরকার বাড়িতে গিয়ে ওটা কোস্তিয়ার বুড়ো মা-বাবাকে তাঁদের ছেলের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে দিয়ে দেব, এ সম্পর্কে আমি এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি।

'আমি তোমাকে অন্য একটা দেব,' ছেলেটাকে আমি কথা দিলাম।

'উঁহু, এইটেই চাই!' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে আবদার ধরে বলল। 'দাও না ওটা আমাকে!'

'কিপ্‌টেমি করো না গাল্‌ৎসেভ,' খলিন আমার কথা অনুমোদন না করে রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে উঠল আমার ওপরে। সে জামাকাপড় পরে আমার ও কাতাসনভের অপেক্ষায় ছিল। 'ছোট মনের পরিচয় দিয়ো না,' সে বলল।

'আমি তোমাকে অন্য আরেকটা দেব। হুবহু এরকম দেখতে,' ছেলেটাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি।

'ওরকম ছুরি তুমি পাবে'খন,' আমার ছুরিটা নিরীক্ষণ করে কাতাসনভ ওকে কথা দিল। 'আমি যোগাড় করে দেব।'

'আমি তোমাকে দেব, সত্যি বলছি!' আমি ওকে আশ্বাস দিলাম। 'কিন্তু এটা হল উপহার, বুঝতে পারছ — একটা স্মৃতিচিহ্ন!'

'আচ্ছা, বলছ যখন ঠিক আছে,' ছেলেটা শেষকালে রাজি হয়ে

মুখ ভার করে বলল। 'এখন ত অন্তত রেখে যাও, আমাকে একটু খেলতে দাও ওটা দিয়ে।'

'ছুরিটা রেখে দিয়ে চল দেখি এবারে,' খলিন আমাকে তাড়া দিল।

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে যাব কেন? কোন্ দুঃখে, শুনি?' তুলোর কোর্তাটার বোতাম আঁটতে আঁটতে আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করে বললাম। 'তোমরা ত আর আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিচ্ছ না। আর নৌকো কোথায় আছে অমনিতেই তোমরা জান — তার জন্যে আমার সাহায্যের কোন দরকার নেই।'

'চলে এসো, চলে এসো,' খলিন আমাকে ঠেলা মারল। 'আমি তোমাকে নেব, তবে আজকে নয়,' সে বলল।

আমরা তিনজনে বেরিয়ে এসে বড় বড় গাছের তলায় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে রক্ষাব্যূহের ডান দিকের উদ্দেশে যাত্রা করি। গুঁড়ি গুঁড়ি ঠাণ্ডা বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার, আকাশ মেঘে ঢাকা — নিশ্ছিদ্র কালো — একটা তারাও চোখে পড়ে না, এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই।

কাতাসনভ স্যুটকেস নিয়ে আমাদের আগে আগে চলছে — চলছে না ত, যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। তার পা ফেলার কোন আওয়াজ হচ্ছে না, সে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে পা ফেলছে যে মনে হয় বুঝি রোজ রাতে এই পায়ে-চলা-পথে যাতায়াত করে আসছে। আমি ফের খলিনকে ছেলেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জানতে পারলাম যে ছোট্ট বন্দারেভ এসেছে গোমেল থেকে, কিন্তু যুদ্ধের আগে ও বাবা-মা'র সঙ্গে বালটিক এলাকার কোন সীমান্ত ঘাঁটিতে থাকত। তার বাবা সীমান্ত-রক্ষী — যুদ্ধের প্রথম দিনেই মারা যায়। ওরা যখন পিছু হটতে থাকে, সেই সময় তার দেড় বছরের ছোট বোনটি তারই কোলে গুলিতে মারা যায়।

'ওকে এত সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে যে আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নে,' খলিন ফিসফিস করে বলল। 'ও গেরিলাদের দলে ছিল, ত্রাস্তিয়ানেৎসের ডেথ-ক্যাম্পে ছিল। ...ওর মাথায় কেবল একটা চিন্তা — প্রতিশোধ নিতে হবে—একটা লোককেও ছাড়া চলবে না! যখন ক্যাম্পের বর্ণনা দেয়, কিংবা বাবা আর ছোট বোনটার কথা মনে করে তখন ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে। একটা ছোট শিশুর মধ্যে যে এত ঘৃণা জমা থাকতে পারে আমি আগে কখনও ভাবি নি।'

খলিন এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল, তারপর খুব নীচু গলায় ফিসফিস করে বলতে থাকে:

'দু'দিন ধরে ওর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে — কত করে বলছি সুভরভ স্কুলে ভর্তি হতে! কম্যান্ডার ত ওকে ভালো কথা বলে, ধমক দিয়ে — কত রকমে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত রাজি হল একটি শর্তে — এই শেষ বারের মতো যাবে! মুশকিলটা কী জান, ওকে যদি না পাঠাই তাতেও গোলমালের আশঙ্কা আছে। ও যখন প্রথম আমাদের কাছে এসেছিল আমরা না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু তাহলে কী হবে — ও নিজেই চলে গেল। এদিকে ফেরার পথে আমাদেরই রক্ষীরা — শিলিনের রেজিমেণ্টের আউটপোস্ট ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ওর কাঁধে গুলি লাগে। এর জন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। অন্ধকার রাত, তাছাড়া কেউ কিছু জানতও না। বুঝলে কিনা, ও যা করছে কোন বয়স্ক লোকের পক্ষেও তা ক্বচিৎ করা সম্ভব। তোমাদের গোটা গুপ্তচর কোম্পানি মিলে যা করে ও একা তার চেয়ে বেশি কাজ করে। ওরা জার্মান লাইনের আশেপাশে যেতে পারলে কী হবে, সামনের এলাকায় যেতে পারে না। কোন স্কাউটদলের সাধ্যি নেই শত্রুপক্ষের লাইনের

পেছনে ঢুকে পড়ে সেখানে খুঁটি গেড়ে থাকতে পারে — পাঁচ দিন দশ দিনও নয়। কদাচিৎ কোন স্কাউটের পক্ষে তা সম্ভব। আসল কথাটা এই যে একজন বয়স্ক লোক — সে যেমন ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন — সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে — রাস্তার একটা ভিখিরি — শত্রুপক্ষের লাইনের পেছনে স্কাউটিং-এর জন্য এর চেয়ে ভালো মুখোস সম্ভবত আর হয় না... ওকে যদি তুমি আরও কাছে থেকে জানতে পারতে! — ওকে পাওয়া যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া!.. এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে যুদ্ধের পর যদি ওর মা'র খোঁজ না পাওয়া যায়, তাহলে কাতাসনভ কিংবা লেফটেনান্ট কর্ণেল ওকে দত্তক নেবেন।'

'তুমি না হয়ে ওরা কেন?'

খলিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল, 'আমি নিতাম, কিন্তু লেফটেনান্ট কর্ণেল বাগড়া দিলেন। বলেন, আমার নিজেরই নাকি এখনও মানুষ হতে বাকি আছে!' কথাগুলো বাঁকা হাসি হেসে সে বলল।

লেফটেনান্ট কর্ণেলের কথায় আমি মনে মনে সায় না দিয়ে পারি না। খলিনের স্বভাবটা অমার্জিত ধরনের, কখন কখন রীতিমতো গায়ে-পড়া ভাব, কারও কোন ভালো যেন ওর চোখ পড়ে না। এটা অবশ্য ঠিক যে ছেলেটার সামনে সে নিজেকে সংযত রাখে — এমনকি আমার ত মনে হয় ইভানকে যেন একটু ভয়ই পায়।

তীরে পৌঁছুতে যখন দেড়শ' মিটার খানেক বাকি তখন আমরা মোড় নিয়ে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেলাম। সেখানে কাটা ফারগাছের ডালপালার নীচে ডিঙিগুলো লুকানো ছিল। আমার আদেশে ওগুলোকে যে-কোন মুহূর্তে কাজে লাগানোর

মতো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে — যাতে শুকিয়ে না যায় তার জন্য একদিন অন্তর অন্তর জল ছিটানো হয়। ছোট টর্চের আলো জেবলে খলিন ও কাতাসনভ নৌকোগুলো পরীক্ষা করে দেখল, নৌকোর তলা ও পাশ হাতড়ে টোকা মেরে দেখল। তারপর একেকটি ডিঙি উলটে তাতে চড়ে বসল, প্রত্যেক ডিঙির দাঁড়গুলোকে দাঁড়ের আঙটার ভেতরে বসিয়ে 'দাঁড় টেনে' দেখল। অবশেষে যেটাকে তারা বেছে নিল সেটা ছোটখাটো, তার পাছ-গলুইটা চওড়া, তিন-চারজনের বেশি লোক নৌকোটাতে বসতে পারে না।

'এই লোহাগুলোর কোন দরকার নেই।' খলিন শিকলটা চেপে ধরে যেন সে-ই নৌকোর মালিক এই ভাব করে আঙটার প্যাঁচ খুলতে লাগল। 'বাকিটা পাড়ে গিয়ে করা যাবে। প্রথমে জলে পরীক্ষা করে দেখব।'

আমরা নৌকোটা তুললাম — খলিন সামনের দিক ধরল, আমি আর কাতাসনভ — পেছনের দিক। আমরা ওটা নিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঠেলে ঠেলে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

'ধুত্তোর! তোমাদের দিয়ে কিস্যু হবে না!' খলিন হঠাৎ গালাগাল দিয়ে উঠল। 'দাও দেখি!'

আমরা নৌকোটা 'দিলাম'। নৌকোর চেপটা তলার দিকটা পিঠের ওপর নিয়ে দু'হাত মাথার ওপর টেনে সে দু'দিক থেকে দুটো ধার আঁকড়ে ধরল, সামান্য ঝুঁকে পড়ে বড় বড় পা ফেলে কাতাসনভের পিছু পিছু নদীর দিকে চলল।

তীরের কাছাকাছি আসার পর আমি আউটপোস্টকে সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওদের ছাড়িয়ে আগে চলে গেলাম — আমার মনে হয় এই জন্যই ওদের দরকার ছিল আমাকে।

খলিন তার বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে জলের দিকে নেমে গেল,

তারপর থামল। আমরা তিনজনে যাতে কোন শব্দ না হয় এইভাবে সন্তর্পণে নৌকো জলে ছেড়ে দিলাম।

'বসে পড়!'

আমরা নৌকোয় উঠে বসলাম। খলিন নৌকোয় ঠেলা মেরে পাছ-গলুইয়ে চেপে বসল। নৌকো তীর থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। কাতাসনভ সামনে পেছনে দাঁড় টেনে নৌকো চালাতে লাগল — নৌকো কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে ঘুরতে থাকে। এর পর নৌকোটাকে যেন ওলটানোর মতলব নিয়েই ও আর খলিন দু'জনে মিলে একবার নৌকোর বাঁ পাশে আরেক বার ডান পাশে নিজেদের শরীরের পুরো ভার রাখে — ফলে দেখতে দেখতে নৌকো জলে ভরে উঠল। শেষে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে ওরা হাতড়ে হাতড়ে, নৌকোর পাশগুলো আর তলায় হাতের চাপড় মেরে দেখতে লাগল।

'দিব্যি নৌকোটা!' কাতাসনভ ফিসফিস করে অনুমোদনের সুরে বলল।

'চলবে,' খলিনকে মানতে হল। 'ছোকরা মনে হচ্ছে নৌকো চুরিতে ওস্তাদ — আজেবাজে নৌকো নেয় না!.. আচ্ছা গাল্ৎসেভ, সত্যি করে বল ত, কতজন মালিককে পথে বসিয়েছ?'

ডান দিকের তীর থেকে জলের ওপর যখন তখন দমকে দমকে ভেসে আসছে মেশিন-গানের ছর্রার চাপা আওয়াজ।

'এলোপাতাড়ি ছুঁড়ছে,' বিদ্রূপের হাসি হেসে ফিসফিস করে বলল কাতাসনভ। 'অমনি... ত মনে হয় বেশ হিশেবী, একটু যেন কৃপণও, অথচ দেখ কাণ্ড! — অপচয় আর কাকে বলে! অন্ধের মতো গুলি ছুঁড়ে কী লাভটা?.. আচ্ছা কমরেড ক্যাপ্টেন, পরে, ভোরের আগে আগে ওই লাশগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে

আনার চেষ্টা করলে কেমন হয়?' ইতস্তত করে সে খলিনকে প্রস্তাব দিল।

'আজ নয়, অন্য কোন সময়...'

কাতাসনভ স্বচ্ছন্দে দাঁড় বায়। নৌকো তীরে ভেড়ানোর পর আমরা নেমে পড়লাম।

'আচ্ছা, দাঁড়ের যাতে শব্দ-টব্দ না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করব, দাঁড়ের আঙটাতেও গ্রীজ লাগাতে হবে — তাহলেই আর দেখতে হবে না!' খলিন খুশি হয়ে চাপা গলায় কথা বলছে। এবারে আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার এই ট্রেঞ্চের ভেতরে আর কে আছে?'

'আর দু'জন আছে—দু'জন সৈন্য।'

'ওদের একজনকে রাখ। যে বেশি নির্ভরযোগ্য, আর চুপ থাকতে পারে, তাকে। বুঝেছ? আমি এক ফাঁকে সিগারেট খেতে তার কাছে আসব — যাচাই করে দেখব... আউটপোস্ট-প্লেটুনের কম্যান্ডারকে আগে থেকে জানিয়ে দিও যে রাত দশটার পরে স্কাউটদল সম্ভবত—এই কথাই বলো যে সম্ভবত!'—খলিন জোর দিয়ে বলল, '...ওপাড়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে সবগুলো পোস্টকে যেন সতর্ক করে দেওয়া হয়। আর কম্যান্ডার নিজে যেন থাকে কাছের বড় ট্রেঞ্চটায়, যেখানে মেশিনগান আছে,' এই বলে খলিন হাত দিয়ে স্রোতের উজানের দিকটা দেখিয়ে দিল। 'আমাদের ফেরার পথে ওরা যদি আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে থাকে তাহলে ওর ঘাড়ে আর মাথা আস্ত থাকবে না!.. কে বা কারা যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে এ সম্পর্কে একটা কথাও নয়! মনে রেখো, ইভানের কথা তুমি ছাড়া আর একটি প্রাণীও জানে না। তোমার কাছ থেকে লিখিত কোন প্রতিশ্রুতি আমি চাইছি না, তবে মনে থাকে যেন, যদি কিছু ফাঁস হয় তাহলে কিন্তু...'

আমি বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বললাম, 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে বড়? আমি কি কচি খোকা নাকি?'

'হ্যাঁ, আমিও ত তা-ই বলি। যা হোক, তুমি রাগ করো না।' সে আমার কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আমার কাজ তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। আচ্ছা, এবারে কাজে লেগে যাও!'

কাতাসনভ ইতিমধ্যেই নৌকোটা ঠিকঠাক করার কাজে লেগে গেছে। খলিন সে দিকে এগিয়ে গেল, সেও কাজে হাত লাগাল। আমি মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে নদীর তীর ধরে চলতে লাগলাম।

খানিক দূরেই আউটপোস্টের প্লেটুন কম্যান্ডারের দেখা মিলে গেল — সে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে রাউন্ড দিয়ে পোস্টগুলো যাচাই করে দেখছিল। খলিন আমাকে যেমন যেমন বলেছিল আমি তাকে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিয়ে ব্যাটেলিয়নের হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে গিয়ে এটা-ওটা নানা নির্দেশ দিয়ে, কিছু কাগজপত্রে সই দিয়ে ফিরে এলাম আমার সুড়ঙ্গ-ঘরে।

ছেলেটা ঘরে একা। তাকে দেখাচ্ছিল আগাগোড়া লাল টকটকে, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। তার হাতে কোস্তিয়ার সেই ছুরিটা, বুকের ওপর ঝুলছে আমার বাইনোকুলর, মুখ কাচুমাচু। ঘরের ভেতরে বিশৃঙ্খলার একশেষ — টেবিল উলটে পড়ে আছে, তার ওপর কম্বল বিছানো, বাঙ্কের নীচ থেকে উঁকি মারছে টুলের পায়া।

আমি ঢুকতে অনুনয়ের সুরে সে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করো না। ইচ্ছে করে করি নি... সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে করি নি...'

একমাত্র তখনই আমার নজরে পড়ল সকালে সাদা ঝকঝক করে ধোওয়া মেঝের পাটাতনের ওপর একটা বড় ধ্যাবড়া কালির দাগ।

'তুমি আমার ওপর রাগ কর নি ত?' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'আরে না, না,' আমি উত্তর দিলাম, যদিও সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে বিশৃঙ্খলা, মেঝেতে ধ্যাবড়া কালির দাগ আমার ধাতে একদম সয় না।

আমি আর কোন কথা না বলে সব যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে থাকি, ছেলেটা আমাকে সাহায্য করে। কালির দাগটা এক নজর দেখে সে বলল, 'জল গরম করা দরকার। সাবান জল লাগবে। আমি ঘষে তুলে দেব।'

'ও কিছু নয়, আমি নিজে দেখব'খন পরে।'

আমার বেশ খিদে পেয়েছিল, তাই টেলিফোনে ছ'জনের মতো রাতের খাবার আনতে বললাম। আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে নৌকো নিয়ে লাগার পর খলিন আর কাতাসনভেরও আমার চেয়ে কম খিদে পায় নি।

স্কাউটদের কাহিনী সংবলিত পত্রিকাটির ওপর দৃষ্টি যেতে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল, এটা পড়েছ?'

'হুঁ... দুর্দান্ত! তবে সত্যি বলতে গেলে কি, এরকম হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবার কথা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পরে আবার ওদের বুকে মেডেলও ঝুলেছিল।'

'কিন্তু তুমি মেডেল পেলে কী করে?' আমি কৌতূহল বোধ করলাম।

'এটা পেয়েছি সেই গেরিলাদলে থাকার সময়।'

'তুমি গেরিলাদলেও ছিলে নাকি?' কথাটা যেন প্রথম শুনছি, এমন ভাব করে অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কিন্তু সেখান থেকে চলে গেলে কেন?'

'বনের ভেতরে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়ি, তখন আমাকেও

প্লেনে করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ঐ এলাকার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং-স্কুলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেখান থেকে চম্পট।'

'চম্পট? — বল কী?'

'হ্যাঁ, পালালাম। কঠিন ব্যাপার-স্যাপার ওখানে, মোটে সহ্য হল না। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করা আর কি। কাজের মধ্যে কাজ — মুখস্থ কর — মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। নয়ত মানুষের জীবনে তৃণভোজী প্রাণীদের অবদান...'

'কিন্তু এগুলোও ত জানা দরকার।'

'দরকার। কিন্তু এখন আমার জেনে কী হবে? কী কাজে লাগবে? প্রায় এক মাস আমি সহ্য করলাম। রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবি — আমি এখানে কেন আছি? কিসের জন্যে?'

'বোর্ডিং-স্কুল অবশ্যই তুমি যা চাও সে জিনিস নয়,' আমি সায় দিয়ে বললাম। 'তোমার যা দরকার সেটা অন্য কিছু। সুভরভ স্কুলে যদি ভর্তি হতে পারতে সেটা একটা কাজের কাজ হত!'

'খলিন তোমাকে শিখিয়েছে বুঝি?' চট করে সে জিজ্ঞেস করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

'খলিন শেখাতে যাবে কেন? এটা আমার নিজের ধারণা। তুমি যুদ্ধ-টুদ্ধ করেছ — গেরিলাদলে ছিলে, স্কাউটিং-এর কাজও করেছ। তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছ। এখন তোমার যা দরকার তা হল বিশ্রাম করা, পড়াশুনা করা। তুমি একটা কী দারুণ অফিসার হতে পার, জান?'

'না, না, খলিন তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে!' ছেলেটা বেশ প্রত্যয়ের সুরে বলল। 'তবে ওতে কোন কাজ হবে না!.. অফিসার আমি পরেও হতে পারি — সে সময় পাওয়া যাবে'খন। কিন্তু

এখন যুদ্ধ চলছে — এখন একমাত্র সেই লোকই বিশ্রাম করতে পারে যাকে দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হবার নয়।'

'কথাটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে এখনও বাচ্চা!'

'বাচ্চা?.. আচ্ছা, তুমি কখনও কোন ডেথ-ক্যাম্প দেখেছ?' হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল। তার চোখে যে ভয়ঙ্কর ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল সেটা কোন বাচ্চার কাছ থেকে আশা করা যায় না। তার ছোট্ট ওপরের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'তুমি আমাকে কী বোঝাতে এসেছ, শুনি?' সে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল। 'তুমি... তুমি কিছুই জান না। যা জান না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। ...মিছিমিছি চেষ্টা করছ কেন?'

কয়েক মিনিট বাদে খলিন এসে হাজির। প্লাইউডের ছোট স্যুটকেসটা বাঙ্কের তলায় গুঁজে দিয়ে সে ধপ করে টুলে বসে পড়ল, দারুণ আগ্রহ ভরে হুমহুম করে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

'খালি সিগারেট ফোঁকা,' অসন্তুষ্ট ভাবে ছেলেটা মন্তব্য করল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ছুরিটা দেখছিল, একবার খাপ থেকে বার করে আবার খাপে পুরে ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে ঝোলাতে ঝোলাতে সে বলল, 'সিগারেট ফুঁকলে ফুসফুস সবুজ হয়ে যায়।'

'সবুজ হয়ে যায়?' অন্যমনস্ক ভাবে হাসতে হাসতে খলিন বলল। 'তা হোক না। কে আর দেখতে পাচ্ছে?'

'তুমি সিগারেট খাও এটা আমি চাই নে। আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।'

মুচকি হেসে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে খলিন উঠে দাঁড়াল। ছেলেটার মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে দেখে সে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত ঠেকাল। এবারে সে অসন্তুষ্ট স্বরে বলল:

'আবার হুটোপাটি খেলা?.. না না, এ ভালো নয়। শুয়ে পড় দেখি! বিশ্রাম কর! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়!'

ছেলেটা ওর কথায় বাধ্য হয়ে বাঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ল। খলিন আরও একটা সিগারেট বার করে তার নিজেরই পোড়া সিগারেটের টুকরো থেকে আরও একটা ধরিয়ে গায়ে গ্রেটকোট চাপিয়ে সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি লক্ষ করলাম সিগারেট ধরানোর সময় ওর হাতটা সামান্য কাঁপছিল। আমার নার্ভগুলো না হয় 'ছেঁড়া ন্যাতার মতো,' কিন্তু অপারেশনের আগে আগে ও নিজেও কম নার্ভাস হয়ে পড়ছে না। আমার মনে হল ও কেমন যেন অন্যমনস্ক, চিন্তিত। অমনিতে তার যে অত নিরীক্ষণের ক্ষমতা, তা সত্ত্বেও কিন্তু সে মেঝের ওপর কালির দাগটা লক্ষ করল না, তাছাড়া তাকে দেখাচ্ছিলও কেমন যেন অদ্ভুত। অবশ্য এমনও হতে পারে যে এটা আমার নিছক কল্পনা।

সে বাইরে মিনিট দশেক ধূমপান করার পর (সম্ভবত একটার বেশিই সিগারেট খেয়েছিল) ফিরে এসে আমাকে বলল, 'ঘণ্টা দেড়েক পরে বেরিয়ে পড়ছি। রাতের খাবার দাও।'

'কাতাসনভ গেল কোথায়?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।

'ডিভিশনাল কম্যান্ডারের কাছ থেকে জরুরী ডাক এসেছে। ডিভিশনে চলে গেছে।'

'চলে গেল কী রকম?' ছেলেটা ধড়মড় করে উঠে বসল। 'চলে যাবার আগে একবার দেখা করে গেল না পর্যন্ত? বলে গেল না আমি যেন ভালোয়-ভালোয় কাজ সেরে ফিরে আসতে পারি?'

'ওর উপায় ছিল না। ওরা বিপদে পড়ে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে,' খলিন বোঝানোর চেষ্টা করল। 'আমি ধারণাই করতে পারছি না ওখানে কী ঘটল... ওরা যে জানে ওকে আমার দরকার, অথচ হঠাৎ কিনা ডেকে পাঠাল...'

'এক ছুটে দেখা করে গেলেও ত পারত। হুঃ, আবার বলে কিনা বন্ধু!' উত্তেজিত হয়ে আহত স্বরে ছেলেটি বলল। ওর মেজাজ সত্যি-সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে।

আধ-মিনিট খানেক সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল, তারপর এদিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি আমরা দু'জন মাত্র যাচ্ছি?'

'না, তিনজন। ও আমাদের সঙ্গে যাবে,' দ্রুত শির সঞ্চালন করে ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিল খলিন।

আমি ভেবাচেকা খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি — ও ঠাট্টা করছে ভেবে মুচকি হাসলাম।

'অমন হাসি-হাসি মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকালে কী হবে? আমি কিন্তু ইয়ারকি করছি না,' খলিন জানাল। তার মুখের ভাব গুরুগম্ভীর, এমনকি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

তবু আমি ওর কথা বিশ্বাস করি না, চুপ করে থাকি।

'তুমি নিজেই ত চেয়েছিলে! অমন করে ঝোলাঝুলি করতে থাকলে! এখন কিনা ভয় পাচ্ছ!' আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলল। তার দৃষ্টিতে এমন একটা অবজ্ঞা মেশানো অপ্রসন্ন ভাব ছিল যে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি হঠাৎ অনুভব করলাম, বুঝতে শুরু করলাম যে ও ঠাট্টা করছে না।

'আমি ভয় পাচ্ছি না!' ভেতরে ভেতরে চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিতে নিতে আমি দৃঢ়স্বরে জানালাম। 'আসলে কেমন যেন আচমকা কিনা তাই...'

'জীবনে সবই আচমকা,' খলিন ভাবালু হয়ে পড়ল। 'আমি তোমাকে নিতাম না, বিশ্বাস কর — এছাড়া আর কোন উপায় নেই। বুঝতেই পারছ, কাতাসনভকে ওরা কোন একটা বিপদে পড়ে ডেকে পাঠিয়েছে। ওখানে যে কী ঘটল ধারণা করতে পারছি নে... আমরা ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরব,' খলিন আশ্বাস দিল। 'তবে সিদ্ধান্ত যা নেবার নিজেকে নিতে হবে। কোন কিছু ঘটলে তার জন্য আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো চলবে না। যদি বেরিয়ে পড়ে যে তুমি কারও কোন অনুমতি না নিয়ে ওপাড়ে গিয়েছিলে, তাহলে আমাদের ওপর একচোট হবে। তাই বলি সেরকম কিছু ঘটলে 'খলিন বলেছিল, খলিন পীড়াপীড়ি করে, খলিন আমাকে উস্কানি দেয়', এই সব বলে বলে কাঁদুনি গাওয়া চলবে না। এমন যেন না হয়! মনে রেখ, তুমি নিজেই পীড়াপীড়ি করেছিলে। তাই ত?.. সে রকম কিছু ঘটলে আমার কপালে অবশ্যই জুটবে, কিন্তু তুমিও পার পাবে না... এখন তোমার জায়গায় কাকে রেখে যাবে ভাবছ?' একটু চুপ থাকার পর সে কাজের কথা পাড়ল।

'আমার পলিটিক্যাল ইউনিটের অ্যাসিস্টেণ্ট কলবাসভকে,' একটু চিন্তা করে আমি বললাম। 'বেশ লড়ুয়ে ছোকরা...'

'ছোকরা লড়ুয়ে ঠিকই। কিন্তু ওর সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে না পড়াই ভালো। পলিটিক্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট-টেসিস্টেণ্টরা আবার বেশি নীতি-নিয়ম মেনে চলে — তুমি টেরও পাবে না, কোথা থেকে পলিটিক্যাল রিপোর্টের মধ্যে আমরা পড়ে যাব, তাহলে আর দেখতে হবে না,' খলিন বাঁকা হাসি হেসে চোখ ওপরের দিকে উলটে বলল, 'ভগবান আমাদের রক্ষা করুন সে বিপদ থেকে!'

'তাহলে পাঁচ নম্বর কোম্পানির কম্যাণ্ডার গুশ্চিনকে।'

'সে তুমি যা ভালো বোঝ, নিজেই ঠিক কর!' এই বলে সে উপদেশ দিল, 'তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ ওকে জানিও না। তুমি যে ওপাড়ে যাচ্ছ একথা জানবে শুধু আউটপোস্টের লোকেরা। বুঝলে ত? শত্রুপক্ষ আত্মরক্ষা করছে, তাই তাদের দিক থেকে সক্রিয় কোন উদ্যোগের আশঙ্কা নেই একথা মনে রাখলে, সত্যি বলতে গেলে, কীই বা ঘটতে পারে?.. কিছুই না! তাছাড়া তুমি তোমার অ্যাসিস্টেণ্টকে রেখে মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে অন্য কোথাও গেছ। কোথায়?.. এই ধর গাঁয়ে... আমরা ফিরে আসব দু'ঘণ্টা বাদে... খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টা... কী এমন একটা বিরাট কাজ যে বলতে হবে!'

ও আমাকে বৃথাই বুঝ দেবার চেষ্টা করছিল। ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই, হেড কোয়ার্টার জানতে পারলে সত্যি সত্যি যা-তা কাণ্ড হবে। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, তাই ওসব নিয়ে মাথা না ঘামানোর চেষ্টা করি। আমার সামনে এখন যে কাজ আমার সমস্ত মন প্রাণ তার ওপর পড়ে থাকে।

আগে কখনও স্কাউটিং-এর কাজে যাওয়া আমার ভাগ্যে হয়ে

ওঠে নি। অবশ্য এটা ঠিক যে মাস তিনেক আগে আমি আমার কোম্পানি নিয়ে দস্তুরমতো লড়াই করে স্কাউটিং-এর কাজ পরিচালনা করেছি — কাজে বেশ সফলও হয়েছি। কিন্তু লড়াই করে স্কাউটিং-এর কাজ চালানোকে কি আর স্কাউটিং বলা চলে?.. আসলে এ হল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ মাত্র, তফাৎ এই যে অল্প সময়ের জন্য এবং সীমিত সেনাবল নিয়ে এই যুদ্ধ।

স্কাউটিং-এর কাজে এর আগে আর কখনও আমাকে যেতে হয় নি, তাই আসন্ন কাজের কথা ভেবে স্বভাবতই আমি উত্তেজিত না হয়ে পারলাম না।

পাঁচ

রাতের খাবার এলো। আমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খাবারের ডেকচি-টেকচি আর গরম চায়ের কেটলি নিয়ে এলাম। এছাড়াও আমি টেবিলের ওপর এক ভাঁড় ঘন দই আর টিনের মাংস রাখলাম। আমরা খেতে বসি। ছেলেটা আর খলিন অল্প খাবার খেল, আমারও খিদে মরে গেছে। ছেলেটার মুখ দেখে মনে হল যেন দুঃখ পেয়েছে, একটু বিষণ্ণ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কাতাসনভ যে একবার দেখা দিয়ে তার সাফল্য কামনা না করে চলে গেল এতে তার মনে বড় আঘাত লেগেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সে আবার বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এঁটোকাঁটা তুলে টেবিল যখন সাফ করা হয়ে গেল তখন খলিন ম্যাপ বিছিয়ে কাজের ধারার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকে।

আমাদের তিনজনকে নৌকো করে নদীর ওপাড়ে যেতে হবে;

নৌকো ঝোপের মধ্যে রেখে দিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে স্রোতের উজান ধরে খাত পর্যন্ত ছয়শ' গজ মতন এগিয়ে যাব। খলিন ম্যাপে জায়গাগুলো দেখাল।

'অবশ্য ভালো হত যদি আমরা নৌকো চালিয়ে সোজা চলে যেতে পারতাম এই জায়গাটায়, কিন্তু ওখানকার পাড়টা একেবারে খালি — নৌকো লুকানোর মতো কোন জায়গা নেই,' সে বলল।

তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের পজিশনের মুখোমুখি এই খাত ধরে ছেলেটাকে জার্মান প্রতিরক্ষাব্যূহের সামনের এলাকা পার হতে হবে।

কোন কারণে যদি ওরা ওকে দেখে ফেলে, তাহলে আমি আর খলিন জলের ধার থেকে আত্মপ্রকাশ করে তৎক্ষণাৎ লাল রকেট ছেড়ে আমাদের গোলন্দাজদের গোলা ছোঁড়ার সঙ্কেত দেব — এই ভাবে জার্মানদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে ছেলেটা যাতে পিছু হটে নৌকোর দিকে আসতে পারে 'যে-কোন মূল্যে' সে পথ করে দিতে হবে। সকলের শেষে পিছু হটবে খলিন।

ছেলেটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের রকেটের সঙ্কেত পেয়ে 'সহায়ক অস্ত্রগুলি' — ৭৬ মিলিমিটার কামানের দুটো ব্যাটারি, ১২০ মিলিমিটার মর্টারের একটা ব্যাটারি, দুটো মর্টারের এবং একটা মেশিনগানের কোম্পানি — বাম তীর থেকে প্রচণ্ড গোলার আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে চোখ ধাঁধিয়ে হকচকিয়ে দেবে, খাতের দু'ধারে জার্মানদের যে-সমস্ত ট্রেঞ্চ আছে সেগুলির ওপর কামানের গোলা ও মর্টারের আগুন বর্ষণ করে জার্মানদের মাটি ছেড়ে ওঠার পথ বন্ধ করতে হবে, এবং পরে ওদের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা রোধ করে আমাদের নৌকোয় পিছু হটে যাবার সুবিধা করে দেবার জন্য আরও বাঁয়েও সেই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

খলিন বাঁ তীরের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার সংকেতগুলি আমাকে জানাল, খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সব পরিষ্কার ত?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার বলেই ত মনে হচ্ছে।'

একটু চুপ করে থেকে শেষকালে আমি আমার দুশ্চিন্তার কথা জানালাম — নদী পার হওয়ার পর ছেলেটাকে যখন আমরা একা অন্ধকারের মধ্যে ফেলে রেখে যাব তখন যদি সে দিক ঠিক না রাখতে পারে? কিংবা যদি গোলাবর্ষণ হয় সেক্ষেত্রে ওর কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই কি?

মাথার ইশারায় ছেলেটাকে দেখিয়ে খলিন বলল যে 'ও' কাতাসনভের সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের পজিশন থেকে শত্রুপক্ষের তীরে পার হয়ে যেখানে উঠতে হবে সে জায়গাটা ভালোমতো দেখে রেখেছে, ওখানকার প্রত্যেকটা ঝোপ, প্রতিটি ঢিবি ওর জানা। আর আর্টিলারির গোলাবর্ষণের কথা যদি বল, গোলন্দাজরা আগে থেকে লক্ষ্যের জায়গাগুলো ভেদ করে দেখেছে, আশি গজ মতন চওড়া একটা 'প্যাসেজ' রেখে দেওয়া হবে।

আমি না ভেবে পারলাম না, কত রকমের অভাবিত দুর্ঘটনাই না ঘটতে পারে! কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। ছেলেটা বিষণ্ন মনে অন্যমনস্ক হয়ে এক দৃষ্টে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। তার মুখে অভিমানের চিহ্ন, আমার মনে হল যেন একেবারে নির্বিকার ভাব, যেন আমাদের কথাবার্তার সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক নেই।

আমি ম্যাপের নীল রেখাগুলি নিরীক্ষণ করে দেখলাম — ওগুলো হল জার্মান প্রতিরক্ষাব্যূহের গভীরে তাদের সেনাদলের

বিন্যাস। জিনিসটা বাস্তবে দেখতে কেমন হতে পারে মনে মনে কল্পনা করার পর আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, পার হওয়ার জন্য যে জায়গাটা বেছে নিয়েছ তোমার কি ধারণা সেটা বেশ ভালো? আর্মির ফ্রণ্টে কি এমন আর একটাও সেক্টর নেই যেখানে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার আয়োজন এতটা নিবিড় নয়? তুমি কি বলতে চাও এর মধ্যে কোন দুর্বল জায়গা নেই, ফাঁক নেই... ধর অন্তত সংযোগের জায়গায়?'

খলিন তার খয়েরি রঙের চোখ কুঁচকে ব্যঙ্গভরে আমার দিকে তাকাল।

'তোমরা সাব-ইউনিটের লোকেরা তোমাদের নাকের ডগায় যা দেখছ তার বাইরে এক ইঞ্চিও দেখতে পাও না!' বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে জানাল। 'তোমাদের খালি মনে হয় যে প্রতিপক্ষের মূল শক্তি বুঝি তোমাদের বিরুদ্ধেই লাগানো হয়েছে, অন্য সব সেক্টরে রক্ষণের ব্যবস্থা দুর্বল — লোক-দেখানো গোছের! তোমার কি ধারণা যে আমরা ভেবেচিন্তে জায়গা বাছি নি, কিংবা আমরা তোমার চেয়ে কম বুঝি?.. আর যদি জানতে চাও তাহলে মনে রেখো, সমস্ত ফ্রণ্ট জুড়ে জার্মানদের এত সৈন্য গাদা করা আছে যে তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না! সংযোগের জায়গার কথা যে বলছ সেখানে তারা যথেষ্ট সজাগ — অত বোকা পাও নি ওদের! আজকালকার দিনে অত বোকা কেউ নেই। কয়েক ডজন মাইল ধরে চলে গেছে প্রতিরক্ষার নিরেট, নিশ্ছিদ্র দেয়াল,' খলিন বেজার হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কথা বললে বটে! আরে বাপু, অনেক বার করে সব দিক রীতিমতো ভেবে দেখা হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে হুট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, মনে রেখো!'

সে উঠে পড়ল, তারপর ছেলেটার কাছে গিয়ে, তার পাশে

বাঙ্কের ওপর বসে নীচু গলায় নির্দেশ দিতে লাগল — বুঝতেই পারছিলাম, এ-ই প্রথম বার নয়।

'খাতের ভেতরে কিনার ঘেঁষে চলবে। মনে রাখবে, নীচটায় আগাগোড়া মাইন পোঁতা। থেকে থেকে কান পেতে শুনবে। চলতে চলতে থেমে গিয়ে শোনার চেষ্টা করবে! ট্রেঞ্চে টহলদাররা চৌকি দিচ্ছে, তাই গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে। টহলদার সরে যাওয়ামাত্র সুরুৎ করে ট্রেঞ্চ পার হয়ে সামনের পথ ধরবে।'

আমি পাঁচ নম্বর কোম্পানির কম্যান্ডার গুশিচনকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে ওকে কিছু সময়ের জন্য আমার কাজের দায়িত্ব নিতে হবে, প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দিয়ে ওকে চার্জ বুঝিয়ে দিলাম। রিসিভার রাখার পর ফের শুনতে পেলাম খলিনের মৃদু কণ্ঠস্বর:

'ফেদোরভ্‌কায় অপেক্ষা করবে। অযথা কোন ঝুঁকি নেবে না। সবচেয়ে বড় কথা, যা করার সাবধানে করবে!'

'সাবধান হওয়ার কথা খুব ত বললে! — ভাবছ, অতই সোজা?' ছেলেটা যে ভাবে কথাগুলো বলল তার মধ্যে ঈষৎ বিরক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

'জানি। কিন্তু তোমাকে সাবধান হতে হবে। সব সময় মনে রাখবে, তুমি একা নও। মনে রাখবে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি সব সময় তোমার কথা ভাবি। লেফটেন্যান্ট কর্ণেলও ভাবে...'

'কিন্তু কাতাসনভ কিছু না বলেই চলে গেল, একবার এলোও না,' ছেলেটার কথার মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠল এক অবুঝ শিশুর অভিমান।

'আমি যে তোমাকে বললাম, ওর উপায় ছিল না। ওখানে কোন

বিপদ ঘটায় ওর জরুরী তলব পড়েছে। তা নইলে... তুমি ত জানই ও তোমাকে কত ভালোবাসে! তুমি ত জান, বিশ্বসংসারে ওর কেউ নেই, ওর কাছে তোমার মতো আর কেউ নেই। তাই না?'

'হ্যাঁ,' নাক টেনে সায় দিয়ে বলল সে, কিন্তু গলা তার কাঁপছিল। আবারও বলল, 'কিন্তু তাহলেও একছুটে এসে দেখা করে যেতে পারত ত...'

খলিন ওর পাশে শুয়ে ওর শণরঙের নরম চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ফিসফিস করে ওকে কী যেন বলল। আমি ওদিকে কান দেওয়ার কোন চেষ্টা করি না। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার অনেক কাজ। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাড়াহুড়ো করে কাজগুলো সারার চেষ্টা করি, কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারার মতো অবস্থা তখন আমার নেই, তাই হাল ছেড়ে দিয়ে মা'র কাছে চিঠি লিখতে বসি। আমি জানতাম যে স্কাউটরা কোন কাজের ভার নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আত্মীয়স্বজন ও আপনজনদের কাছে চিঠি লেখে। কিন্তু আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি, আমার ভাবনাচিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। পেন্সিলে আধ-পৃষ্ঠাখানেক লেখার পর সেটা ছিঁড়ে চুল্লীর ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'সময় হয়ে গেছে,' ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে আমাকে জানিয়ে দিয়ে খলিন উঠে পড়ল। জার্মানদের কাছ থেকে বাগানো স্যুটকেসটা সে বেঞ্চের ওপর রাখল, বাঙ্কের তলা থেকে একটা পোঁটলা বার করে সেটার গিঁট খুলল। আমরা দু'জনেই পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে লাগলাম।

ভেতরে মোটা সুতির পোশাক পরার পর ওপরে সে চড়াল পাতলা পশমী প্যান্ট ও সোয়েটার, তারপর শীতকালের উপযোগী ফিল্ড-শার্ট ও ট্রাউজার, আর সবচেয়ে ওপরে কামুফ্লেজ করার

জন্য সবুজ রঙের একটা ঢিলে আঙরাখা। আমিও ওর দেখাদেখি ঐ রকম পোশাক পরতে লাগলাম। কাতাসনভের পশমী প্যান্টটা আমার আঁটো হচ্ছিল, কুঁচকির সেলাইয়ের কাছটা ছিঁড়ে যাবার মতন অবস্থা। আমি কী করব বুঝে উঠতে না পেরে খলিনের দিকে তাকালাম।

'ও কিছু নয়, ঠিক আছে,' উৎসাহ দিয়ে সে বলল। 'চালিয়ে যাও! ছিঁড়ে গেলে আবার নতুন পাওয়া যাবে।'

কামুফ্লেজের আঙরাখাটা আমার গায়ে প্রায় সমান-সমান, ওপরের ট্রাউজারটা অবশ্য একটু খাটো। পায়ে আমরা পরি লোহার নাল লাগানো জার্মান হাইবুট। সেগুলো কেমন যেন ভারী-ভারী, পরার অভ্যেসও নেই। কিন্তু খলিন বলল এই জুতো পরতে হচ্ছে সতর্কতার খাতিরে — যাতে ওপাড়ে আমাদের 'পায়ের দাগ না পড়ে'। খলিন নিজে আমার কামুফ্লেজের আঙরাখার ফিতে বেঁধে দিল।

দেখতে দেখতে আমরা তৈরি। আমাদের কোমরের বেল্টে ঝুলছে ছুরি আর 'এফ-৬' গ্রেনেড (খলিন আবার এছাড়াও নিয়েছে ট্যাঙ্ক-বিরোধী ভারী গ্রেনেড — 'আর. পি. জি. ৪০'), জামার ভেতরে গুঁজে নিয়েছি গুলিভরা পিস্তল, কামুফ্লেজের আঙরাখার আস্তিনের তলায় লুকানো আছে কম্পাস আর জ্বলজ্বলে ডায়ালওয়ালা হাতঘড়ি। ঝলকানি ছেড়ে সঙ্কেত করার পিস্তলগুলো ঠিক আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখা হল, খলিন টমিগানের চাকতি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা দেখে নিল।

আমরা দস্তুরমতো প্রস্তুত। এদিকে ছেলেটার ওঠার কোন নাম নেই। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। দু'হাতের তালু মাথার নীচে রেখে শুয়ে আছে।

বড় জার্মান স্যুটকেসটার ভেতর থেকে বার করা হয়েছে বাচ্চা

ছেলের গায়ের মাপের বাদামী রঙধরা ছিন্নভিন্ন তুলোর কোর্তা, গাঢ় ছাইরঙা তালি মারা প্যান্ট, রঙচটা কান-ঢাকা টুপি আর অল্পবয়সী ছেলেদের মাপের একজোড়া কদাকার হাইবুট। বাঙ্কের কিনারায় বিছিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরে পরার জামাকাপড় — মোটা কাপড়ের তৈরি, পুরানো — সর্বত্র রিফু করা ফতুয়া আর পশমী মোজা, পিঠে ঝোলানোর একটা ছোট্ট তেলচিটে ঝুলি, জুতোর ভেতরে পায়ে জড়ানোর ফালি কাপড় এবং আরও কিছু ন্যাকড়া।

এক টুকরো হাতে বোনা কাপড়ে খলিন ছেলেটার জন্য খাবার-দাবার জড়িয়ে দিল। খাবার বলতে আধ কিলো খানেক সসেজ, দু'টুকরো লবন দেয়া চর্বি, খানিকটা কাটা রুটি, রাই আর গমের রুটির কয়েকটা বাসি টুকরো। সসেজটা বাড়ির তৈরি, আর চর্বিও আমাদের আর্মির বরাদ্দ থেকে নয় — এবড়োখেবড়ো, পাতলা, নোংরা নুন মাখানোর ফলে গাঢ় ছাই-ছাই; তাছাড়া রুটিরও কোন ছিরি ছাঁদ নেই — সরাসরি চুল্লীর আঁচে, বাড়িতে তৈরি।

দেখেশুনে আমি ভাবি, গোটা ব্যাপারটা, প্রতিটি খুঁটিনাটি কেমন সযত্নে ভেবে তৈরি।

খাবার-দাবার ঝুলির ভেতরে গুছিয়ে রাখা হল। ছেলেটা কিন্তু তখনও শুয়ে আছে, নড়াচড়ার কোন চাড় দেখাচ্ছে না। এদিকে খলিন আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে, একটি কথাও না বলে ঝলকানি ছোঁড়ার বন্দুকটা সে নিরীক্ষণ করতে থাকে, টমিগানের চাকতি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা দেখতে থাকে।

অবশেষে ছেলেটা বাঙ্কের ওপরে বসে ধীরেসুস্থে গায়ের সামরিক ইউনিফর্ম খুলতে থাকে। গাঢ় নীল রঙের ঢোলা প্যান্টটার হাঁটুতে আর পেছনের দিকে নোংরা লেগেছে।

'আলকাতরা লেগেছে,' সে বলল। 'পরিষ্কার করা হয় যেন।'

7–886

'তার চেয়ে বরং স্টোরে ফেরত দিয়ে একটা নতুন আনালে কেমন হয়?' খলিন বলল।

'না, এটাই পরিষ্কার করে দিক।'

কোন রকম ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে সে অসামরিক পোশাক গায়ে চড়াল। খলিন তাকে সাহায্য করল, তারপর চার পাশ থেকে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আমিও দেখি — কে বলবে না ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটা হাঘরে ছেলে নয়! এমন উদ্বাস্তু ছেলে ত আমরা যুদ্ধের সময় পথেঘাটে হামেশাই দেখে থাকি।

একটা হাতে তৈরি ভাঁজ-করা-ছুরি আর লেপা-পোঁছা কতকগুলি কাগজের নোট — জার্মান মার্ক। জার্মানদের দখল করা এলাকায় এগুলি চালু আছে। এছাড়া আর কিছু সে সঙ্গে নিল না।

'এবারে একটু লাফ ঝাঁপ দিয়ে দেখা যাক,' খলিন আমাকে বলল।

কেমন দাঁড়ায় দেখার জন্য আমরা কয়েক বার লাফালাম। ছেলেটাও, যদিও তার কাছে এমন কোন জিনিসই ছিল না যাতে শব্দ হতে পারে।

রুশ দেশের প্রাচীন প্রথামতো যাত্রার আগে আমরা তিনজনে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ছেলেটার চোখেমুখে আবার ফুটে উঠেছে সেই একাগ্রতা, সেই মানসিক উত্তেজনার ছাপ, যা শিশুদের চেহারায় দেখা যায় না। এই চেহারাতেই তাকে দেখেছিলাম ছয় দিন আগে, যখন আমার সুড়ঙ্গ-ঘরে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটে।

ছয়

অন্ধকারে আমরা যাতে ভালো দেখতে পাই সেই জন্য আমাদের সংকেত করার টর্চের লাল আলোর কিরণ এক ঝলক চোখে লাগানোর পর আমরা নৌকো যেখানে আছে সে দিকে রওনা দিলাম। আমি চলেছি আগে আগে, ছেলেটা আমার পনেরো পা আন্দাজ পিছে, তারও পেছনে খলিন।

পথে যার যার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে আমাকে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও হবে আমাকে, যাতে সেই ফাঁকে ছেলেটা লুকিয়ে পড়তে পারে। এখন ওকে দেখতে পাবার কথা কেবল আমাদের — আর কারও নয়। এ ব্যাপারে খলিন আমাকে রীতিমতো সতর্ক করে দিয়েছে।

ডান দিকে অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিল কম্যান্ড দেওয়ার মৃদু আওয়াজ: 'গান্-ক্রু — পজিশন!.. অ্যাকশন!..' ঝোপঝাড় মটমট করে উঠল, মৃদুস্বরে লোকজনের গালাগাল শোনা যাচ্ছে — আমার ব্যাটেলিয়ন আর তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের এলাকায় বড় বড় গাছপালার নীচেকার ঝোপেঝাড়ে যেখানে যেখানে কামান আর মর্টার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল গান্-ক্রুরা সে সব জায়গায় পজিশন নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ।

এই অপারেশনে আমরা ছাড়াও শ' দুয়েক লোক অংশ নিচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে জার্মানদের পজিশনের ওপর প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করে আমাদের ঢাকা দেবার জন্য ওরা প্রস্তুত। সাহায্যকারী ইউনিটগুলোর কম্যান্ডিং অফিসারদের খলিন যেমন বলতে বাধ্য হয়েছিল যে আচমকা হানা দেওয়া হচ্ছে, এছাড়া যে আর কিছু ঘটতে পারে, সে রকম কোন সন্দেহ পর্যন্ত ওদের কারও মনে উদয় হয় নি।

নৌকোটা যেখানে ছিল তার একটু দূরেই আউটপোস্ট। ওটা ছিল ডবল সেণ্ট্রি পোস্ট। কিন্তু খলিনের নির্দেশে আউটপোস্ট কম্যাণ্ডারকে আমি হুকুম দিয়ে রেখেছিলাম কেবল একজন লোককে — দিওমিন নামে এক মাঝবয়সী, বুদ্ধিমান ল্যান্স কর্পারালকে ট্রেঞ্চের ভেতরে রাখার। আমরা যখন তীরের কাছাকাছি চলে এসেছি তখন খলিন আমাকে বলল আমি যেন ল্যান্স কর্পারালের কাছে গিয়ে তাকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখি — এই ফাঁকে ছেলেটাকে নিয়ে সে অলক্ষ্যে সটকান দিয়ে নৌকোর কাছে চলে আসবে। এত সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমার কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। তবে খলিনের গোপনীয়তায় আমি অবাক হই না — আমি জানি যে শুধু ও কেন, সব স্কাউটই এই রকম।

'হ্যাঁ, কোন মন্তব্য নয় কিন্তু!' আমি সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে বেশ প্রভাবব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিস করে খলিন আমাকে সতর্ক করে দিল।

পদে পদে এই ধরনের সতর্কবাণী আমাদের বিরক্তি ধরিয়ে দিল। হাজার হোক আমি কচি খোকা নই। কী ব্যাপার, কিসের জন্য — এসব আমি নিজেও বুঝতে পারি।

দিওমিন নিয়মমাফিক দূর থেকে আমার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, আমি সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ট্রেঞ্চের ভেতরে লাফিয়ে পড়ে এমন ভাবে দাঁড়াই যাতে আমার মুখোমুখি হতে গেলে তাকে রাস্তার দিকে পিঠ ফেরাতে হয়।

'নাও, সিগারেট ধরাও,' সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটা নিয়ে আরেকটা তার হাতে গুঁজে দিলাম।

আমরা উবু হয়ে বসলাম। কয়েকটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেশলাইয়ের কাঠি খচখচ করে জ্বালানোর চেষ্টা করার পর শেষ

পর্যন্ত একটা জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত কাঠিটা সে আমার দিকে এগিয়ে দিল, নিজেও ধরাল। দেশলাইয়ের আলোয় আমি লক্ষ করলাম ট্রেঞ্চের সামনে মাটির স্তূপ দিয়ে যে প্রাচীর করা আছে তার ঠিক নীচে কোটরের মধ্যে খড়ের গাদায় কে যেন ঘুমোচ্ছে। এটুকু সময়ের মধ্যেই লোকটার মাথার টুপির লাল টকটকে কানাটাও আমার নজরে এড়াল না — কেমন যেন অদ্ভুত চেনা-চেনা মনে হল। সোৎসাহে সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে বিনা বাক্যব্যয়ে আমি টর্চ জ্বালালাম, দেখলাম কোটরের মধ্যে যে শুয়ে আছে সে আর কেউ নয় — কাতাসনভ। সে চিত হয়ে শুয়ে আছে, টুপি দিয়ে তার মুখটা ঢাকা। তখনও আমার কিছু বোধগম্য হচ্ছে না — আমি টুপিটা তুললাম — দেখতে পেলাম মুখটা ছাই হয়ে গেছে, ঠিক যেন একটা লাজুক খরগোসের মতন মুখের ভাব। বাঁ চোখের ওপরের দিকে একটা ছোট্ট নিখুঁত ফুটো — গুলি ফুঁড়ে চলে গেছে।

'যা-তা কাণ্ড হয়ে গেল।' দিওমিন আমার পাশ থেকে মৃদুস্বরে বিড়বিড় করে বলল — আমার মনে হল তার কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। সে বলতে লাগল, 'নৌকো ঠিকঠাক করার পর ওরা আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে সিগারেট খেল। ক্যাপ্টেন এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, কিন্তু এই লোকটা গুঁড়ি মেরে ওপরে উঠতে গেল, সবে উঠে দাঁড়িয়েছে — মানে, ট্রেঞ্চ থেকে উঠেছে — সঙ্গে সঙ্গে আস্তে করে গড়িয়ে পড়ল নীচে। গুলির কোন আওয়াজ পর্যন্ত যেন আমরা শুনতে পেলাম না। ক্যাপ্টেন ওর দিকে ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন, 'কাতাসনভ! কাতাসনভ!..' আমরা চেয়ে দেখলাম — এক গুলিতেই শেষ!.. ক্যাপ্টেনের হুকুম, কাউকে যেন না বলি।'

আচ্ছা, এই বার বুঝতে পারলাম তীর থেকে ফেরার পর খলিনকে আমার কেন খানিকটা অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

'কোন মন্তব্য নয়!' নদীর দিক থেকে শুনতে পেলাম তার কর্তৃত্বসূচক চাপা কণ্ঠস্বর।

আমি সবই বুঝি — ছেলেটা একটা কাজের ভার নিয়ে যাচ্ছে, তাই তার মনে কষ্ট দেওয়া এখন কোন ভাবেই চলতে পারে না — সে যেন কিছু না জানতে পারে।

ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এসে আমি ধীরে ধীরে জলের দিকে নেমে গেলাম।

ছেলেটা ততক্ষণে নৌকোতে উঠে বসেছে। আমি টমিগান বাগিয়ে ধরে তার সঙ্গে পাছ-গলুইতে চেপে বসি।

'আরেকটু ভালো করে ভার সমান সমান রেখে বসো,' খলিন একটা বর্ষাতি দিয়ে আমাদের ঢেকে দিয়ে ফিসফিস করে বলল। 'দেখো নৌকো যেন টাল না খায়।'

সামনের দিক থেকে নৌকো ঠেলে দিয়ে সে নিজেও উঠে বসল, দাঁড় বাইতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও একটু অপেক্ষা করে মৃদু শিস দিল — এটা অপারেশন শুরু করার সঙ্কেত।

তৎক্ষণাৎ তার জবাব এলো। তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের পাশ ঘেঁষে ডান দিকের বড় মেশিনগান ট্রেঞ্চের ভেতরে যেখানে সহকারী ইউনিটগুলির কম্যান্ডার আর গোলন্দাজ পর্যবেক্ষকরা আছে সেখান থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে গুড়ুম করে উঠল রাইফেলের গুলির আওয়াজ।

নৌকোটাকে এক পাক ঘুরিয়ে খলিন দাঁড় টানতে লাগল। নদীর তীর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠান্ডা, বাদলা রাতের অন্ধকার আমাদের জড়িয়ে ধরল।

* * *

আমি উপলব্ধি করি আমার মুখের ওপর সমান তালে খলিনের গরম নিশ্বাস পড়ছে। সে খুব জোরে জোরে দাঁড় ফেলে নৌকো চালাচ্ছে। জলের গায়ে দাঁড়ের আঘাত পড়তে মৃদু ঝপ ঝপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছেলেটা আড়ষ্ট হয়ে আমার পাশে বর্ষাতির নীচে বসে আছে।

সামনে, ডান তীরে জার্মানরা বরাবরের মতোই তাদের ফ্রন্ট লাইন এলাকায় গুলি ছুঁড়ছে, রকেট ছুঁড়ে তাদের এলাকা আলোকিত করে তুলছে। বৃষ্টির দরুন আলোর ঝলক তেমন উজ্জ্বল নয়। বাতাসও বইছে আমাদের দিকে। আবহাওয়া রীতিমতো আমাদের অনুকূল।

আমাদের তীর থেকে নদীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক ট্রেসার বুলেট। তিন নম্বর ব্যাটেলিয়নের বাঁ পাশ থেকে এ ধরনের ট্রেসার প্রত্যেক পাঁচ সাত মিনিট অন্তর অন্তর আসতে থাকবে — এর উদ্দেশ্য হল আমরা যখন আমাদের তীরে ফিরে আসব তখন যেন দিক ঠিক রাখতে পারি।

'চিনি!' ফিসফিস করে খলিন বলল।

আমরা দুটো করে চিনির ডেলা মুখে ফেলে প্রাণপণে চুষতে থাকি। এতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীব্র হওয়ার কথা।

আমরা নির্ঘাত নদীর মাঝামাঝি কোথাও চলে এসেছি, এমন সময় সামনে মেশিনগানের কট কট আওয়াজ শুরু হয়ে গেল, সাঁই সাঁই করে গুলি ছুটতে লাগল, ঝপাং ঝপাং শব্দে আমাদের একদম কাছে জলের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল।

'এম. জি.-৩৪,' আমার ওপর এখন যেন তার আস্থা হয়েছে এই

ভাবে আমার গা ঘেঁষে সরে এসে ছেলেটা ফিসফিস করে বলল। ধরেছে কিন্তু সে ঠিকই।

'ভয় হচ্ছে নাকি?'

'একটু,' অস্ফুটস্বরে সে উচ্চারণ করল। 'কিছুতেই অভ্যেস হচ্ছে না। নার্ভগুলো যেন কেমন হয়ে যায়... আবার ভিক্ষে করা — সেটাও অভ্যেস করতে পারছি না একেবারে। ওঃ কী বিশ্রী যে লাগে!'

ওর মতন একজন আত্মসচেতন ছেলের কাছে — যার আত্মসম্মান বোধ আছে, তার পক্ষে ভিক্ষে করাটা যে কতদূর অপমানজনক, আমি মনে মনে বেশ কল্পনা করতে পারি।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে যেতে ফিসফিস করে বললাম, 'আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা কথা বলি — আমাদের ব্যাটেলিয়নে একজন বন্দারেভ আছে। সেও কিন্তু গোমেলের লোক। তোমার কোন আত্মীয়-টাত্মীয় নয় ত?'

'না। আমার কোন আত্মীয় নেই। থাকার মধ্যে আছে কেবল মা। তাও জানি না, এখন কোথায়...' বলতে বলতে তার গলা কেঁপে উঠল। 'আর আমার পদবী, আসলে কিন্তু বন্দারেভ নয় — বুস্লভ।'

'তোমার নামও তাহলে ইভান নয়?'

'না, নাম আমার ইভান ঠিকই।'

'শ্-শ্-শ্!..'

খলিন আগের চেয়ে আস্তে আস্তে নৌকো বাইতে থাকে — সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যেই কূলে ভেড়াবার আশায়। আমি অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলাম — আমার চোখ টাটিয়ে উঠল, কিন্তু বৃষ্টির ছাঁটের পর্দার ভেতর দিয়ে রকেটের আবছা আবছা আলোর ঝলক ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

আমরা কোন রকমে এগিয়ে চলেছি। আর এক মুহূর্ত পরেই নৌকোর তলা বালিতে ঠেকে যাবে। খলিন ঝট করে দাঁড় টানা থামিয়ে নৌকোর পাশ থেকে টুপ করে নেমে পড়ল, জলে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি পাছ-গলুই ধরে নৌকো ঘুরিয়ে তীরের দিকে টেনে আনল।

মিনিট দুয়েক আমরা গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে কান পেতে শুনলাম। শোনা যাচ্ছে জল আর মাটির ওপরে এবং ইতিমধ্যে ভিজে ফুলে ওঠা বর্ষাতির ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মৃদু টুপটাপ। আমি শুনতে পাই সমান তালে খলিনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-পড়া আর আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ। কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু — কোন শব্দ, মৃদু কথাবার্তা বা খসখস আওয়াজ — সে সব কিছুই আমরা ধরতে পারি না। খলিন আমার ঠিক কানের ভেতরে নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল:

'ইভান যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। তুমি নেমে এসে নৌকো চেপে ধর।'

সে অন্ধকারের মধ্যে ডুব মারল। আমি সাবধানে বর্ষাতির ঢাকনার ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এসে জলে নামলাম, তীরের কাছাকাছি বালির ওপর পা রাখলাম; আমার টমিগানটা ঠিকঠাক করে নিয়ে নৌকোর পাছ-গলুই চেপে ধরলাম। আমি টের পেলাম যে ছেলেটা উঠে পড়ে নৌকোর ভেতরে আমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'বসে পড়। বর্ষাতিটা গায়ে চাপা দাও,' হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে ফিসফিস করে আমি বললাম।

'এখন আর এতে কিছু আসে যায় না,' সে এত নীচু গলায় বলল যে প্রায় শোনাই যায় না।

আচমকা খলিনের আবির্ভাব ঘটল। নিবিড় হয়ে কাছে ঘেঁষে এসে চাপা উল্লাসের সুরে জানাল:

'সব ঠিক আছে! কোন অসুবিধে নেই, কোথাও কোন বাধা নেই।'

দেখা গেল জলের কিনারায় যে ঝোপের ভেতরে আমাদের নৌকো লুকিয়ে রাখার কথা সেটা ভাটির দিকে মাত্র তিরিশ পা খানেক দূরে।

কয়েক মিনিট পরে নৌকো লুকিয়ে ফেলা হল, আমরা এবার লাফিয়ে পারে উঠে তীর বরাবর গুড়ি মেরে চলতে থাকি, মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পাতি। রকেট যখন আলোর ঝলকানি তোলে, আমরা খাঁজের নীচে বালির ওপর শুয়ে পড়ি, মড়ার মতো কাঠ হয়ে পড়ে থাকি। চোখের কোণ দিয়ে আমি ছেলেটাকে দেখি — বৃষ্টির জলে ভিজে তার গায়ের জামাকাপড় কালো হয়ে গেছে। আমাদের আর কী? — আমি আর খলিন

ত ফিরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে ফেলব। কিন্তু ওর অবস্থাটা?

খলিন হঠাৎ পায়ের গতি কমিয়ে দিল, ছেলেটাকে হাতে ধরে খানিকটা ডান দিকে জলে নেমে গেল। সামনে বালির ওপর কী যেন চকচক করছে। 'আমাদের স্কাউটদের লাশ,' আমি অনুমান করলাম।

'ওগুলো কী?' চাপা গলায় ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।

'জার্মানদের লাশ,' তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে বলে খলিন ওকে সামনে টেনে নিয়ে গেল। 'ওপাড় থেকে আমাদের স্নাইপার খতম করে দিয়েছে।'

'উঃ, কী জঘন্য! নিজেদের লোকদের গায়েরও জামাকাপড় খুলে নেয়!' ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠে ফিসফিস করে ছেলেটি বলল।

আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন অনন্তকাল চলেছি, অনেক আগে আমাদের যথাস্থানে পেঁছে যাবার কথা। আমি অবশ্য মনে মনে ভেবে দেখলাম যে ঝোপের ভেতরে, যেখানে আমাদের নৌকো লুকানো আছে সেখান থেকে এই লাশগুলো শ' চারেক মিটার দূরে হবে। আর খাতে পেঁছুতে হলে আমাদের এখনও প্রায় অতটা দূরত্বই যেতে হবে।

দেখতে দেখতে আমরা আরও একটা লাশ পেরিয়ে গেলাম। এটা একেবারে গলে পচে গেছে — দূর থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে একটা গা-গুলানো গন্ধ। বাঁ দিকের তীর থেকে আমাদের পেছনে বর্ষণমুখর আকাশ ভেদ করে একটা ট্রেসার চলে গেল। খাতটা কাছেপিঠে কোথাও হবে; কিন্তু আমাদের চোখে পড়ার উপায় নেই — রকেটের আলো জায়গাটার ওপর ফেলা হয় না, সম্ভবত এই কারণে যে এর তলাটায় পুরোপুরি মাইন বসানো, আর কিনারা ধরে আছে অজস্র ট্রেঞ্চ, টহলদাররা অবিরাম টহল দিয়ে চলেছে।

জার্মানরা সম্ভবত এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে এখানে কেউ নাক গলাতে আসবে না।

এই খাতটাকে এক চমৎকার ফাঁদ বলা চলে — এখানে ধরা পড়লে কারও আর বেরোবার উপায় নেই। আমাদের সম্পূর্ণ হিসাবটাই করা হয়েছে এই ভেবে যে ছেলেটা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গলে যেতে পারবে।

খলিন শেষকালে থামল, আমাদের ইশারা করে বসে পড়তে বলে নিজে সে আরও এগিয়ে গেল।

শিগগিরই ফিরে এলো, অস্ফুটস্বরে কম্যান্ড দিল:

'আমার পেছন পেছন চলে এসো!'

আমরা আরও তিরিশ পা খানেক এগিয়ে গেলাম, তারপর একটা খাঁজের পেছনে উবু হয়ে বসে পড়লাম।

'খাতটা সোজা আমাদের সামনে!' কামুফ্লেজের আঙরাখার হাতাটা তুলে জ্বলজ্বলে ডায়ালের দিকে তাকিয়ে খলিন ছেলেটির কানে কানে বলল, 'আমাদের হাতে আর চার মিনিট সময়। কেমন লাগছে?'

'সব ঠিক আছে।'

অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। সোঁদা মাটি আর লাশ পচার গন্ধ। আমাদের ডান দিকে গজ তিনেক দূরে বালির ওপর নজরে পড়ছে একটা লাশ — সেটা সম্ভবত খলিনকে দিক ঠিক রাখতে সাহায্য করছে।

'আচ্ছা, আমি চলি,' ছেলেটা চাপা গলায় বলল।

'আমি তোমাকে এগিয়ে দিই,' হঠাৎ ফিসফিস করে খলিন বলল। 'খাতের — অন্তত খানিকটা।'

এটা কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না।

'না!' ছেলেটা আপত্তি করল। 'একাই যাব। তুমি বড়সড় আছ — ধরা পড়ে যাবে।'

'আমি গেলে কেমন হয়?' ইতস্তত করে শেষকালে আমি বললাম।

'অন্তত খাতের ভেতর দিয়ে যাবার সময় — কী বল?' অনুনয়ের সুরে খলিন ফিসফিস করে বলল। 'ওখানে এ'টেল মাটি — পায়ের দাগ থেকে যাবে। আমি বরং বয়ে নিয়ে যাব তোমাকে।'

ছেলেটা জেদ ধরে, রাগতস্বরে বলল, 'বললাম না! আমি নিজেই পারব!'

সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ছোটখাটো, রোগাপাতলা, আমার মনে হল যেন পুরনো শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ে ঢাকা তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। অবশ্য হতে পারে এটা আমার মনের ভুল।

'আচ্ছা, আবার দেখা হবে,' এক মুহূর্ত থেমে নীচু গলায় সে খলিনকে বলল।

'আবার দেখা হবে!' (আমি অনুভব করলাম ওরা কোলাকুলি করল, খলিন ওকে চুমো খেল।) 'সবচেয়ে বড় কথা, সাবধান! নিজেকে বাঁচিয়ে চলো! আমাদের ফৌজ যদি এগিয়ে যায়, ফেদোরভ্‌কাতে অপেক্ষা করো।'

'আবার দেখা হবে,' এবারে ছেলেটা আমার দিকে ফিরে বলল।

'এসো!' আমি আবেগভরে ফিসফিস করে বললাম। অন্ধকারের মধ্যে তার ছোট্ট পাতলা হাতের তালুটা খুঁজে বার করে শক্ত হাতে করমর্দন করলাম।

ওকে চুমো খাবার একটা প্রবল ইচ্ছে আমি অনুভব করলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে উঠতে পারলাম না। এই মুহূর্তটিতে আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। এই 'এসো' কথাটা বলার

আগেই আমি বার দশেক মনে মনে আউড়ে নিয়েছিলাম যাতে আনাড়ির মতো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে 'বিদায়!' — যেমন হয়েছিল ছয় দিন আগে।

কিন্তু আমি চুমো খাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করার আগেই সে নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সাত

আমি আর খলিল ঘাটের উঁচু জায়গায় গা ঘেঁষে উবু হয়ে এমন ভাবে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম যাতে ঘাটের ওপরকার বেরিয়ে থাকা খাঁজটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে থাকে। এই ভাবে বসে বসে আমরা সতর্ক হয়ে কান পেতে রইলাম। সমান তালে মন্থরগতিতে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। শরৎকালের ঠান্ডা বৃষ্টির ধারা — মনে হচ্ছিল এর যেন কোন শেষ নেই। নদীর জল থেকে উঠে আসছে এক ধরনের স্যাঁতসেঁতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা।

এই ভাবে মিনিট চারেক কেটে যাবার পর ছেলেটা যে দিকে গেছে সেখান থেকে আমাদের কানে এলো পদশব্দ আর কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণে অস্পষ্ট কথাবার্তা।

'জার্মান!'

খলিল আমার কাঁধে চাপ দিল। কিন্তু আমাকে সতর্ক করে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি হয়ত ওর চেয়ে কিছুটা আগেই শুনেছি। আমি টমিগানের সেফটি ক্যাচ ঠেলা দিয়ে ঠিক করে রাখলাম, গ্রেনেড হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলাম।

পদশব্দ এগিয়ে আসছিল। এবারে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল

কয়েকজন লোকের পায়ের তলায় কাদার প্যাচপ্যাচ আওয়াজ। আমার গলা শুকিয়ে এলো, হৃৎপিণ্ডের ওপর দ্রুত হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল।

'Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...'*
'Halte's Maul, Otto! Links halten!'**

ওরা আমাদের এত পাশ ঘেঁষে চলে গেল যে তাদের বুট থেকে ছিটকে পড়া ঠাণ্ডা কাদার ছিটে আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। এক মুহূর্ত পরে রকেটের আলো ঝলকে উঠতে বৃষ্টির ছাঁটের ফাঁক-ফাঁক চিকের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম তাদের লম্বা শরীর (এমনও হতে পারে যে আমার মনে হচ্ছিল, যেহেতু আমি ওদের দেখছিলাম নীচ থেকে) — তাদের মাথায় ক্যাপ-কম্ফর্টারের ওপরে হেলমেট, পায়ে আমার আর খলিনের মতোই ভারী হাইবুট। তিনজনের গায়ে হাতা-ছাড়া বর্ষাতি, একজনের গায়ে বৃষ্টিতে চকচক করছে লম্বা বর্ষাতি — কোমরে বেল্ট বাঁধা, বেল্টের সঙ্গে পিস্তলের খাপ। তাদের কাঁধ থেকে বুকের ওপর ঝুলছে টমিগান।

ওরা ছিল চার জন — এস. এস. রেজিমেণ্টের আউটপোস্ট পেট্রল, জার্মান আর্মির জঙ্গী টহলদার। ওদের মাঝখান দিয়েই এইমাত্র গলে গেল গোমেল এলাকার বারো বছরের ছেলে ইভান বুস্লভ, আমাদের গুপ্তচর দপ্তরের দলিলে যার পরিচয় 'বন্দারেভ'।

রকেটের কাঁপা-কাঁপা আলোয় আমরা যখন ওদের দেখতে পেলাম তখন ওরা আমাদের দশ পা খানেক দূরে জলে নামার উদ্যোগ করছে। অন্ধকারের মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম ওরা বালির

---

* কী জঘন্য আবহাওয়া! চুলোয় যাক!.. (জার্মান)
** বকবকানি বন্ধ কর, অট্টো! বাঁ দিক ধরে চল! (জার্মান)

ওপর লাফিয়ে পড়ে রওনা দিল ঝোপের দিকে, যেখানে আমাদের নৌকোটা লুকানো ছিল।

খলিনের চেয়ে আমার অবস্থা বেশি সঙ্গীন। আমি স্কাউট নই, যুদ্ধের শুরু থেকেই আমি লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করে আসছি — শত্রুদের দেখামাত্র, বন্দুকধারী জলজ্যান্ত শত্রুদের দেখামাত্র মুহূর্তের মধ্যে আমি এমন এক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম যেটা আমার একান্ত অভ্যস্ত — একজন সৈনিক হিশেবে লড়াইয়ের মুহূর্তে একাধিকবার আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই মুহূর্তে যে ইচ্ছাটা — আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যে অদম্য বাসনা, চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা— আমি মনে মনে অনুভব করলাম তা হল কালবিলম্ব না করে ওদের খুন করা। 'আমি দিব্যি হেসে খেলে একটা ছর্‌রা মেরে ওদের ধরাশায়ী করে ফেলব! ওদের মারা উচিত!' আমি যখন আমার টমিগান তুলে ধরে ঘোরালাম তখন সম্ভবত এটাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু আমার হয়ে চিন্তা করছিল খলিন। আমার হাবভাব টের পেয়ে সে সাঁড়াশীর মতো জোরে আমার হাতের সামনের অংশ চেপে ধরল। আমি সংবিৎ ফিরে পেয়ে টমিগান নামিয়ে রাখলাম।

'নৌকোটা ওদের নজরে পড়ে যাবে!' ওদের পায়ের শব্দ দূরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ঘষতে ঘষতে আমি ফিসফিস করে বললাম।

খলিন কোন কথা বলল না।

'কিছু একটা করা দরকার,' একটু থেমে থাকার পর আমি আবার উদ্বিগ্ন হয়ে নীচু গলায় বললাম। 'ওরা যদি নৌকো দেখে ফেলে...'

'যদি!..' খলিন প্রচন্ড খেপে গিয়ে আমার মুখের ওপর এমন নিশ্বাস ফেলল যে মনে হল ও ইচ্ছে করলে আমাকে দম বন্ধ

করে মেরে ফেলতে পারে। 'আর যদি ওরা ছেলেটাকে ধরে ফেলে? তুমি কি মনে কর ওকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে যাব? তুমি কি? — একটা চামার, ইতর, নাকি স্রেফ একটা আহাম্মক?'

'আহাম্মক,' একটু ভেবে আমি মৃদুস্বরে বললাম।

'সম্ভবত তোমার নার্ভের গোলমাল আছে,' খলিন অন্যমনস্ক ভাবে বলল। 'যুদ্ধ শেষ হলে চিকিৎসা করা দরকার।'

আমি উদগ্রীব হয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করি — প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি শুনতে পাব আমাদের নৌকো দেখতে পেয়ে জার্মানরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। আমাদের খানিকটা বাঁয়ে দমকে দমকে মেশিনগান কট কট করে উঠল, সেটার পরে আরও একটা — সরাসরি আমাদের মাথার ওপরে। ফের নিস্তব্ধতা — তার মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ। রকেট উড়ছে—কখনও এখানে, কখনও ওখানে, উপকূলের সমস্ত লাইন জুড়ে। দপ্ করে আলো জ্বলে উঠছে, ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে, হুস হুস আওয়াজ তুলে নিভে যাচ্ছে — মাটিতে পৌঁছানোর পর্যন্ত অবকাশ পাচ্ছে না।

পচা লাশের গা-গুলানো গন্ধটা কেন যেন আরও উৎকট হয়ে উঠল। আমি থুতু ফেললাম, মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হল না।

আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল সিগারেট খাওয়ার। জীবনে কখনও সিগারেট খাওয়ার এমন তীব্র বাসনা আমি অনুভব করি নি। কিন্তু এখন একমাত্র যে কাজটা আমি করতে পারলাম তা হল সিগারেট বার করে আঙুল দিয়ে থেঁতলে তার গন্ধ শোঁকা।

আমরা দেখতে দেখতে ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম, ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম। এদিকে বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই।

'খাতটার ভেতরে আবার ছাই এঁটেল মাটি!' হঠাৎ ফিসফিস

ওপর লাফিয়ে পড়ে রওনা দিল ঝোপের দিকে, যেখানে আমাদের নৌকোটা লুকানো ছিল।

খলিনের চেয়ে আমার অবস্থা বেশি সঙ্গীন। আমি স্কাউট নই, যুদ্ধের শুরু থেকেই আমি লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করে আসছি — শত্রুদের দেখামাত্র, বন্দুকধারী জলজ্যান্ত শত্রুদের দেখামাত্র মুহূর্তের মধ্যে আমি এমন এক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম যেটা আমার একান্ত অভ্যস্ত — একজন সৈনিক হিশেবে লড়াইয়ের মুহূর্তে একাধিকবার আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই মুহূর্তে যে ইচ্ছাটা — আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যে অদম্য বাসনা, চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা— আমি মনে মনে অনুভব করলাম তা হল কালবিলম্ব না করে ওদের খুন করা। 'আমি দিব্যি হেসে খেলে একটা ছর্‌রা মেরে ওদের ধরাশায়ী করে ফেলব! ওদের মারা উচিত!' আমি যখন আমার টমিগান তুলে ধরে ঘোরালাম তখন সম্ভবত এটাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু আমার হয়ে চিন্তা করছিল খলিন। আমার হাবভাব টের পেয়ে সে সাঁড়াশীর মতো জোরে আমার হাতের সামনের অংশ চেপে ধরল। আমি সংবিৎ ফিরে পেয়ে টমিগান নামিয়ে রাখলাম।

'নৌকোটা ওদের নজরে পড়ে যাবে!' ওদের পায়ের শব্দ দূরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ঘষতে ঘষতে আমি ফিসফিস করে বললাম।

খলিন কোন কথা বলল না।

'কিছু একটা করা দরকার,' একটু থেমে থাকার পর আমি আবার উদ্বিগ্ন হয়ে নীচু গলায় বললাম। 'ওরা যদি নৌকো দেখে ফেলে...'

'যদি!..' খলিন প্রচণ্ড খেপে গিয়ে আমার মুখের ওপর এমন নিশ্বাস ফেলল যে মনে হল ও ইচ্ছে করলে আমাকে দম বন্ধ

করে মেরে ফেলতে পারে। 'আর যদি ওরা ছেলেটাকে ধরে ফেলে? তুমি কি মনে কর ওকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে যাব? তুমি কি? — একটা চামার, ইতর, নাকি স্রেফ একটা আহাম্মক?'

'আহাম্মক,' একটু ভেবে আমি মৃদুস্বরে বললাম।

'সম্ভবত তোমার নার্ভের গোলমাল আছে,' খলিন অন্যমনস্ক ভাবে বলল। 'যুদ্ধ শেষ হলে চিকিৎসা করা দরকার।'

আমি উদগ্রীব হয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করি — প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি শুনতে পাব আমাদের নৌকো দেখতে পেয়ে জার্মানরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। আমাদের খানিকটা বাঁয়ে দমকে দমকে মেশিনগান কট কট করে উঠল, সেটার পরে আরও একটা — সরাসরি আমাদের মাথার ওপরে। ফের নিস্তব্ধতা — তার মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ। রকেট উড়ছে—কখনও এখানে, কখনও ওখানে, উপকূলের সমস্ত লাইন জুড়ে। দপ্‌ করে আলো জ্বলে উঠছে, ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে, হুস হুস আওয়াজ তুলে নিভে যাচ্ছে — মাটিতে পৌঁছানোর পর্যন্ত অবকাশ পাচ্ছে না।

পচা লাশের গা-গুলানো গন্ধটা কেন যেন আরও উৎকট হয়ে উঠল। আমি থুতু ফেললাম, মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হল না।

আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল সিগারেট খাওয়ার। জীবনে কখনও সিগারেট খাওয়ার এমন তীব্র বাসনা আমি অনুভব করি নি। কিন্তু এখন একমাত্র যে কাজটা আমি করতে পারলাম তা হল সিগারেট বার করে আঙুল দিয়ে থেঁতলে তার গন্ধ শোঁকা।

আমরা দেখতে দেখতে ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম, ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম। এদিকে বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই।

'খাতটার ভেতরে আবার ছাই এ'টেল মাটি!' হঠাৎ ফিসফিস

করে বলল খলিন। 'এখন জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায় — তাহলে সব ধুয়ে মুছে যায়।'

তার চিন্তা ঘুরে ফিরে বারবার সেই ছেলেটাকে নিয়ে, খাতের এ'টেল মাটির ওপর পায়ের ছাপ স্পষ্ট থেকে যাবে ভেবে তার দুশিচন্তা। খুবই সঙ্গত কারণে যে তার এই দুশিচন্তা তা আমার বুঝতে বাকি ছিল না — একবার যদি জার্মানদের নজরে পড়ে যে নদীর ধার থেকে তাদের সামনের ব্যূহ ভেদ করে অসম্ভব রকমের ছোট ছোট টাটকা পায়ের দাগ চলে গেছে, তাহলে ইভানের সন্ধানে যে ওরা উঠে পড়ে লেগে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত কুকুর নিয়েই সন্ধানে নামবে। আর যেখানেই থাকুক না থাকুক জার্মান এস. এস.-দের রেজিমেন্টগুলোতে মানুষ শিকারের জন্য বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দেয়া কুকুরের কোন অভাব নেই।

আমি ততক্ষণে সিগারেট চিবোতে শুরু করে দিয়েছি। খুব একটা সুবিধার লাগছিল না, তবু চিবোচ্ছিলাম। খলিন সম্ভবত আমার চিবানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, তাই কৌতূহল প্রকাশ করল:

'কী ব্যাপার তোমার?'

'সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে! প্রাণটা আকুলি বিকুলি করছে!' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম।

'আর মা'র কাছে? — মা'র কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না?' খলিন খোঁচা মেরে বলল। 'আমার কথা যদি বল, আমার কিন্তু বড্ড ইচ্ছে করছে মা'র কাছে যেতে। যেতে পারলে মন্দ হত না, কী বল?'

বৃষ্টিতে ভিজে, ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা আরও মিনিট কুড়ি কান পেতে অপেক্ষা করে রইলাম। গায়ের জামা বরফজল-পটির মতো পিঠে লেপটে আছে। ধীরে ধীরে বৃষ্টির বদলে

পড়তে লাগল পেঁজা তুলোর মতন নরম ভিজে গংড়ি গংড়ি বরফ — সাদা চাদরে তীরের বালি ঢেকে দিয়ে অনিচ্ছাভরে গলতে লাগল।

'যাক, মনে হয় এতক্ষণে পেরিয়ে গেছে,' অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এই কথা বলে খলিন উঠে দাঁড়াল।

মাথা নীচু করে তীরের উঁচু খাঁজটার ধার ঘেঁষে আমরা নৌকোর দিকে এগোতে লাগলাম, চলতে চলতে মাঝে মাঝে থেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার কিন্তু প্রায় কোন সন্দেহ ছিল না যে জার্মানরা নৌকোটা দেখতে পেয়েছে, তারা ঝোপের মধ্যে ওত পেতে আছে। কিন্তু একথা বলি-বলি করেও খলিনকে বলতে পারলাম না — আমার ভয় হচ্ছিল ও আমাকে ঠাট্টা করবে।

আমরা অন্ধকারের মধ্যে গংড়ি মেরে নদীর তীর ধরে চলতে চলতে আমাদের স্কাউটদের লাশগংলো যেখানে ছিল সেখানে এসে পড়লাম। সেখান থেকে পাঁচ পা খানেক যেতে না যেতে খলিন আমার পোশাকের আস্তিন টেনে ধরে আমাকে থামিয়ে দিল, কানের কাছে মংখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল:

'এখানে থাকবে। আমি চললাম নৌকো আনতে। যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে — দং'জনেরই ঝংকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। নৌকো চালিয়ে নিয়ে যদি আসি জার্মান ভাষায় আমাকে হাঁক দেবে। খংব নীচু গলায় কিন্তু!.. আর আমি যদি বেকায়দায় পড়ি, তাহলে গোলমাল শংনতে পাবে — তৎক্ষণাৎ সাঁতরে চলে যেয়ো ওপাড়ে। এক ঘণ্টা পরেও যদি দেখ ফিরছি না, তাহলেও সাঁতরে চলে যেয়ো। তুমি যে পাঁচবার এপাড়-ওপাড় হতে পার— তাই না?' বিদ্রংপের সংরে সে বলল।

'আলবত পারি,' আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম। 'কিন্তু ওরা যদি তোমাকে জখম করে?'

'সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। মাথা একটু কম ঘামালেও চলবে।'

'পাড় ধরে নৌকোর কাছে না গিয়ে নদীর দিক থেকে সাঁতার কেটে এখানে যাওয়া বরং ভালো,' আমি কতকটা অনিশ্চিত ভাবে বললাম। 'আমি পারব।'

'আমি হয়ত তা-ই করব। তুমি কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলে ভুলেও মাথা গলাতে যেয়ো না! তোমার যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তাহলে আমাদের কপালে একচোট জুটবে। বুঝলে ত?'

'বুঝলাম, কিন্তু যদি...'

'ওসব 'যদি-টদি' ছাড়... ছোকরা তুমি ভালোই গাল্‌ৎসেভ,' হঠাৎ ফিসফিস করে বলল খলিন, 'তবে কিনা স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে তোমার। আমাদের কাজের বেলায় এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস।'

সে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই পীড়াদায়ক প্রতীক্ষা কতক্ষণ চলল জানি না — আমি এমন জমে গিয়েছিলাম, এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে ঘড়ির দিকে তাকানোর কথা পর্যন্ত আমার মাথায় আসে নি। এতটুকু শব্দ যাতে না হয় সে দিকে সতর্ক থেকে শরীর অন্তত খানিকটা গরম রাখার জন্য আমি জোরে জোরে হাত নাড়াতে লাগলাম, ঘন ঘন বৈঠক দিতে লাগলাম। থেকে থেকে আমি স্তব্ধ হয়ে কান পাততে লাগলাম।

অবশেষে জলের ক্ষীণ ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ উঠল — এত ক্ষীণ যে প্রায় শোনা যায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত মুখের সামনে চোঙের মতো করে ধরে ফিসফিসিয়ে বললাম:

'হল্ট... হল্ট...'

'ধ্যুত্তোর, আস্তে! এদিকে চলে এসো।'

সন্তর্পণে পা ফেললাম। কিন্তু কয়েক পা যেতেই ঠাণ্ডা জল বুটের ভেতরে গলগল করে ঢুকে গেল — আমি আমার পায়ে অনুভব করলাম হিমশীতল আলিঙ্গন।

'খাতের ওখানে কী অবস্থা? শান্ত?' খলিনের প্রথম প্রশ্ন।

'শান্ত।'

'তাহলে দেখলে ত। তুমি কিনা ভয় পাচ্ছিলে!' সে খুশি হয়ে ফিসফিস করে বলল। 'পাছ-গলুইতে গিয়ে বোস,' আমার কাছ থেকে টমিগানটা নিয়ে সে হুকুম দিল। আমি নৌকোয় উঠে বসতে না বসতে সে দাঁড় ফেলতে শুরু করল, স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকো বাইতে লাগল।

নৌকোর গলুইয়ে ঠিক মতো উঠে বসার পর আমি পায়ের জুতো টেনে খুলে জুতোর ভেতর থেকে জল ফেললাম।

রাশি রাশি তুলোর মতো ঘন হয়ে বরফ পড়ছিল, পড়ে নদীর সংস্পর্শে আসতে না আসতেই গলে যাচ্ছিল। বাঁ তীর থেকে আরও একটা ট্রেসার এলো। সেটা সোজা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। নৌকো ঘোরানো দরকার, অথচ খলিন নৌকো চালিয়ে যাচ্ছে উজান ঠেলে।

'কোন্ দিকে চালাচ্ছ তুমি?' ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কোন জবাব না দিয়ে সে প্রবল উৎসাহে দাঁড় টেনে চলল।

'আমরা কোন্ দিকে চলেছি?'

'আর যদি এমন হয় যে ও এখনও পেরোতে পারে নি?' খলিন হঠাৎ বলল। 'যদি এমন হয় যে ও ওখানে মাটিতে শুয়ে

আছে, সুযোগের অপেক্ষা করছে? ওঃ, এই সময় ওর সঙ্গে থাকার কী ইচ্ছেই না আমার করছে!'

এবারে আমি বুঝতে পারলাম খলিন কেন ফিরে যাচ্ছে না। আমরা এখন খাতটার উলটো দিকে, যাতে সেরকম হলে ফের শত্রুপক্ষের তীরে নেমে ছেলেটাকে সাহায্য করতে যেতে পারি। এদিকে ওখান থেকে অন্ধকার ভেদ করে ঘন ঘন নদীর ওপর ঝরে পড়ছে মেশিনগানের দীর্ঘ ছর্‌রা। জলের ওপর নৌকোর কাছাকাছি সাঁই সাঁই শব্দে, শিস দিয়ে গুলি পড়তে দেখে আমার গা ছমছম করতে লাগল। ভিজে তুষারপাতের ভারী পর্দার আড়ালে, এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমাদের দেখতে পাওয়া হয়ত অসম্ভবই ছিল; কিন্তু যেখানে মাটির ভেতরে আশ্রয় নেওয়া যায় না, মাথা গোঁজার মতো কোন ঠাঁই নেই, সেখানে শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে জলে, খোলা জায়গায় থাকাটা অতি বিশ্রী ব্যাপার! খলিন কিন্তু আমাকে উৎসাহ দিয়ে ফিসফিস করে বলল:

'এরকম এলেবেলে গুলিতে যদি কেউ মরে তাকে আহাম্মক বা ভীতু ছাড়া আর কী বলা যায়! মনে রেখো!'

কাতাসনভ আহাম্মক ছিল না, ভীতুও ছিল না। এতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি খলিনকে কিছু বললাম না।

আমাদের বড় সাধের ওপাড় থেকে, বাঁ দিকের তীর থেকে আরও তিনটি ট্রেসার দেখা গেল — এগুলো আমাদের ফেরার সঙ্কেত। অথচ আমরা এখনও দক্ষিণতীরের কাছাকাছি জলে ঘুরঘুর করছি।

'চলে গেছে বলেই মনে হচ্ছে,' অবশেষে এই কথা বলে জোরে জোরে দাঁড় ফেলে সে এমন ভাবে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল যে ঢেউয়ের ধাক্কায় আমি টাল খেয়ে পড়লাম।

অন্ধকারের মধ্যে দিক ঠিক রেখে সে এমন নিখুঁত ভাবে

নৌকো চালাতে লাগল যে দেখলে অবাক হতে হয়। বড় মেশিনগান ট্রেঞ্চের কাছাকাছি আমাদের ব্যাটেলিয়নের ডানপাশে যেখানে আউটপোস্ট প্লেটুনের কম্যান্ডার ছিল, আমাদের নৌকো সেখানে এসে ভিড়ল।

লোকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, আমরা পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নীচু গলায় অথচ কর্তৃত্বসূচক হাঁক শোনা গেল: 'হল্ট! কে যায়?..' আমি সঙ্কেত-বাক্য বললাম — ওরা আমাকে আমার কণ্ঠস্বরে চিনতে পারল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা তীরে নেমে পড়লাম।

আমার অবস্থা তখন একেবারে কাহিল। আমি হি-হি করে কাঁপছিলাম, আড়ষ্ট পা টেনে টেনে অতি কষ্টে চলছিলাম। চেষ্টা করে দাঁতে দাঁত লাগার ঠক ঠক আওয়াজ চেপে রেখে আমি নৌকো উঠিয়ে কামুফ্লেজ করে রেখে দেবার হুকুম দিলাম। আমরা স্কোয়াড কম্যান্ডার সার্জেণ্ট জুয়েভের সঙ্গে তীর ধরে এগিয়ে চললাম। জুয়েভ আমার প্রিয়পাত্র। লোকটা খানিকটা গায়ে-পড়া ধরনের বটে, কিন্তু বেশ ডাকাবুকো। সে আমাদের আগে আগে চলছিল।

'কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট, ওদের অন্ধিসন্ধি বার করার জন্যে যে বন্দী আনার কথা ছিল তার কী হল?' ঘুরে দাঁড়িয়ে সে খুশি খুশি গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'বন্দী? কিসের বন্দী?'

'বাঃ, শুনলাম যে লোক ধরে আনার জন্যে ওপাড়ে গিয়েছিলেন?'

খলিন আমার পেছন পেছন যাচ্ছিল। একথা শুনে সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জুয়েভের দিকে পা বাড়াল।

'বন্দী? তোমার জিভটাকে ধরে বন্দী করে রাখ! বুঝেছ?'

প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে সে রূঢ়স্বরে বলল। আমার মনে হল সে যেন তার ওজনদার হাতটা জুয়েভের কাঁধে নামিয়ে দিল, এমনকি যেন তার কলার চেপে ধরল। এই খলিন লোকটা বড় বেশি সোজা ধরনের, আর বদরাগীও — তার পক্ষে এটা অসম্ভব নয়। 'জিভটা সামলে!' সে শাসিয়ে বলল। 'হ্যাঁ, দাঁত কপাটি দিয়ে বন্দী করে রাখ! সেটাই তোমার পক্ষে ভালো!.. আচ্ছা, এবারে পোস্টে ফিরে যেতে পার।'

জুয়েভকে পেছনে ফেলে আমরা কয়েক পা এগিয়ে যেতে না যেতে খলিন কড়া গলায় এবং ইচ্ছে করেই গলা চড়িয়ে বলল:

'তোমার ব্যাটেলিয়নের লোকজন যত রাজ্যের আবোল-তাবোল বকবক করতেও পারে, গাল্‌ৎসেভ! আমাদের কাজের বেলায় এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস।'

অন্ধকারের মধ্যে সে আমার হাত ধরে কনুইতে চাপ দিয়ে ঠাট্টাছলে ফিসফিস করে বলল:

'তবে তুমিও বেশ যা হোক! ব্যাটেলিয়ন ছেড়ে উধাও — গিয়ে হাজির ওপাড়ে — কেন? — না, খবর আদায়ের জন্যে বন্দী ধরে আনতে! শিকারী আর কাকে বলে!'

সুড়ঙ্গ-ঘরের মধ্যে বাড়তি মর্টার চার্জের সাহায্যে চটপট চুল্লী জেবলে জামাকাপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমরা তোয়ালে দিয়ে গা মুছলাম।

শুকনো জামাকাপড় পরে খলিন তার ওপরে গ্রেটকোট চাপাল, টেবিলের ধারে বসে সামনে ম্যাপ বিছিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সুড়ঙ্গ-ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন যেন মিইয়ে গেছে — তাকে ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

আমি টেবিলের ওপর কিছু টিনের মাংস, শুয়োরের চর্বি,

একপাত্র জারানো শসা, রুটি, ঘন দই ইত্যাদি খাবার ও কিছু পানীয় রাখলাম।

'ইশ, যদি জানা যেত ওর অবস্থাটা এখন কী রকম!' হঠাৎ খলিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'কী যে হল কে জানে?'

'কেন? কী ব্যাপার?'

'ওপাড়ের সেই টহলদারী দলের কথা বলছি আর কি — ওখান দিয়ে ওদের যাবার কথা ছিল আরও আধ ঘণ্টা পরে। বুঝলে কিনা? অর্থাৎ, দাঁড়াচ্ছে এই যে হয় জার্মানরা তাদের আউটপোস্টের রুটিন পাল্‌টেছে নয়ত আমরা কোন একটা গণ্ডগোল করে ফেলেছি। ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন ছেলেটাকে নিজের জীবন দিয়ে এর মাশুল দিতে হতে পারে। আমাদের যে প্রতিটি মিনিট ধরে সব হিশেব করা ছিল।'

'কিন্তু ও ত পার হয়ে গেছে। আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম — এক ঘণ্টার কম হবে না — কোথাও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।'

'পার হয়ে গেছে কী বলছ?' খলিন বিরক্ত হয়ে বলল। 'তাহলে জেনে রেখো, ওকে পেরোতে হবে পঞ্চাশ কিলোমিটারেরও বেশি। তার মধ্যে বিশ কিলোমিটার খানেক — ভোরের আলো ফোটার আগে। প্রতি পদে জার্মানদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া দৈবাৎ আরও কত ঘটনাই না ঘটতে পারে!.. সে যাক গে, ওসব কথা বলে ত ওর কোন সাহায্য হবে না!..' সে টেবিলের ওপর থেকে ম্যাপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দাও দেখি!'

আমরা পানীয়ের মগ তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলাম।

'ওঃ কাতাসনভ, কাতাসনভ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুরু কুঁচকে

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'তোমার কাছে ও আর কে! কিন্তু ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।'

ছেলেটার জিনিসপত্র সমেত স্যুটকেসটা যেখানে বাঙ্কের ওপর ছিল সেদিকে ঘুরে সে নীচু গলায় বলল:

'তুমি যাতে ফিরে আস, তোমাকে যাতে আর যেতে না হয় তার জন্যে। তোমার ভবিষ্যতের জন্যে।'

আমরা মগের পানীয় গলায় ঢেলে খাবার খেতে শুরু করলাম। সেই মুহূর্তে আমরা দু'জনেই নিঃসন্দেহে ভাবছিলাম ছেলেটার কথা। চুল্লীর পাশগুলো আর ওপরটা গনগনে লাল হয়ে উঠেছে, গরম হাওয়া ছাড়ছে। আমরা ফিরে এসে বসে আছি উষ্ণতার মধ্যে, নিরাপদ আশ্রয়ে। এদিকে ও কোথায় শত্রুপক্ষের এলাকার মধ্যে বরফ আর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে পদে পদে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

শিশুদের ওপর বিশেষ ধরনের কোন টান আমি কখনও

অনুভব করি নি, কিন্তু এই ছেলেটাকে — যদিও আমি তাকে মাত্র দু'বার দেখেছি — আমার এত কাছের, এত আপন বলে মনে হল যে ওর কথা মনে হতে আমার মনটা ব্যথায় টনটন না করে উঠে পারল না।

'দু' বছরের ওপরে হয়ে গেল যুদ্ধ করছ ত?' ধূমপান করতে করতে খলিন জিজ্ঞেস করল। 'আমিও তাই। কিন্তু সাক্ষাৎ মরণের অভিজ্ঞতা — যেমন ইভানের হয়েছিল! — আমি বলব, আমাদের হয়ত তার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে হয় নি! তোমার পেছনে আছে ব্যাটেলিয়ন, রেজিমেন্ট, গোটা আর্মি। কিন্তু ও? ও একা!' হঠাৎ কী যেন মনে হতে খলিন গলার স্বর চড়িয়ে বলল। 'একটা বাচ্চা ছেলে! আর তুমি কিনা কোথাকার কী একটা ছুরি সেটা প্রাণে ধরে দিতে পারলে না!'

আট

'প্রাণে ধরে দিতে পারলে না!' না, দিতে আমি পারলাম না। এই ছুরি কাউকে দেবার অধিকার আমার ছিল না — সে যে-ই হোক না কেন। এটা আমার নিহত বন্ধুর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, তার একমাত্র ব্যক্তিগত জিনিস যা রক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু আমি আমার কথা রাখলাম। ডিভিশনের অর্ডন্যান্স ওয়ার্কশপে ফিটারের কাজ করত উরাল অঞ্চলের এক মাঝবয়সী সার্জেন্ট। লোকটা হাতের কাজে বেশ ওস্তাদ। গত বসন্তকালে সে কোস্তিয়ার ছুরির হাতল খোদাই করেছিল। এখন আমি তাকে ঠিক ঐ রকমই একটা হাতল তৈরি করে দিতে বললাম। সেই সঙ্গে অবতরণ বাহিনীর একটা আনকোরা ছুরি দিয়ে বললাম সেটা যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বলা নয়, জার্মানদের

কাছ থেকে ফিটার মিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতির যে একটা সেট আমার হাতে এসেছিল সেটা আমি ওকে এনে দিলাম। তার মধ্যে ছিল একটা সাঁড়াশী, কয়েকটা তুরপুন আর বাটালি। এগুলো আমার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু জিনিসগুলো পেয়ে বাচ্চা ছেলেদের মতো ওর খুশি আর ধরে না।

হাতলটা বানানোর কাজে সে এতটুকু ফাঁকি দিল না — ছুরিদুটোর মধ্যে তফাত সম্ভবত এইটুকুই ছিল যে কোম্পিয়ারটা খাঁজ কাটা আর তার হাতলের মাথায় ছিল মালিকের নামের আদ্যাক্ষর 'ক. খ.'। এমন একটা সুন্দর হাতলওয়ালা সত্যিকারের অবতরণ বাহিনীর ছুরি পেয়ে ছেলেটা যে কী খুশি হবে আমি মনে মনে বেশ কল্পনা করতে পারছিলাম। ওর মনোভাব বুঝতে না পারার কোন কারণ আমার ছিল না — আমি নিজেও ত এই কিছু দিন আগেও এরকম উঠতি বয়সের ছেলে ছিলাম।

এই নতুন ছুরিটা আমি আমার বেল্টে ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াতে লাগলাম — আমার আশা ছিল এর পর খলিন কিংবা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই ওটা তাদের কারও হাতে তুলে দেব। আমি নিজে যে-কোন দিন ইভানের দেখা পাব এমন কথা ধারণা করাও ছিল স্রেফ বোকামি। ও এখন কোথায় থাকতে পারে? — বারবার ওর কথা মনে করেও আমি কোনমতে ধারণায় আনতে পারি না।

এদিকে দিনগুলো ছিল উত্তেজনাপূর্ণ — আমাদের ডিভিশন শত্রুব্যূহ ভেঙে নীপার পার হয়েছে, তথ্য ও প্রচারবিভাগের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে আমাদের ডিভিশন 'দক্ষিণ তীরে আক্রমণের পাদভূমি আরও বিস্তৃত করে তোলার জন্য সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে'।

ছুরিটা বলতে গেলে আমি প্রায় কাজে লাগাই নি — অবশ্য

একবার হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় ওটা আমাকে চালাতে হয়েছিল। ওটা না থাকলে হামবুর্গের মোটাসোটা ভারী চেহারার কর্পোরালটি সম্ভবত কোদালের বাড়ি মেরে আমার মাথা দু' ফাঁক করে দিত।

জার্মানরা বেপরোয়া হয়ে বাধা দিতে লাগল। আট দিন ধরে ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালানোর পর আমরা আত্মরক্ষামূলক পজিশন গ্রহণের নির্দেশ পেলাম — আর ঠিক এই সময়, মেঘমুক্ত নির্মল এক ঠান্ডা দিনে, অক্টোবর বিপ্লবের উৎসব উদ্‌যাপনের ঠিক আগে আগে আমি লেফটেনান্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্‌নভের দেখা পেলাম।

ভদ্রলোক মাঝারি আকৃতির। বেশ ছেঁচা গড়নের শরীরের ওপর তাঁর বড়সড় মাথাটা বসানো। গায়ে গ্রেটকোট, মাথায় কান-ঢাকা টুপি। ফিন অভিযানের সময় তাঁর ডান পা জখম হয়েছিল। সেই পাটা সামান্য ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সদর রাস্তার পাশ ধরে তিনি পায়চারি করছিলেন। আমার ব্যাটেলিয়নের বাকি লোকজন ছিল একটা উপবনের প্রান্তে। বনের ভেতর থেকে সেখানে বেরিয়ে আসামাত্র দূর থেকে তাঁকে দেখেই আমি চিনতে পারলাম। 'আমার' ব্যাটেলিয়ন বলার সম্পূর্ণ অধিকার এখন আমার আছে, কেননা শত্রুব্যূহ ভেদ করার অভিযানের পূর্বমুহূর্তে ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার পদে আমার নিয়োগ পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল।

আমরা যে উপবনে ছিলাম সেই জায়গাটা শান্ত, হালকা তুষারকণায় সাদা রঙধরা গাছের পাতায় মাটি ঢেকে গেছে, ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই সেকশনে ব্যূহভেদ করার সময় কসাক কোর অংশগ্রহণ করেছিল, উপবনটা ছিল কসাকদের বিরতির জায়গা। ঘোড়া আর গোরুর গন্ধ ছেলেবেলা থেকে আমার মনে টাটকা দোয়া দুধ আর উনুন থেকে সদ্য তুলে আনা গরম

গরম সেঁকা রুটির গন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই এখনও আমার মনে পড়ে গেল আমার জন্মস্থান সেই গ্রামের স্মৃতি, যেখানে ছোটবেলায় প্রতি বছর গরমকাল কাটাতাম আমার দিদিমার কাছে। ছোটোখাটো, শুকনো চেহারার সেই বুড়োমানুষটি, আমার দিদিমা আমাকে যেমন ভালোবাসতেন তার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। এ সবই যেন এই সেদিনকার কথা, কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় অনেক দূরের, আর কখনও ফিরে আসার নয় — যেমন ফিরে আসার নয় যুদ্ধের আগের আরও সব জিনিস।

উপবনের প্রান্তে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার শৈশব স্মৃতিচারণে ছেদ পড়ল। সদর রাস্তাটা ভরে আছে জার্মানদের গাড়িতে — সেগুলি জ্বালানো, ভাঙাচোরা, কিংবা স্রেফ পরিত্যক্ত; রাস্তায়, রাস্তায় ধারের খানাখন্দে নানা ভঙ্গিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিহত জার্মানদের শব। ট্রেঞ্চে ক্ষতবিক্ষত মাঠের সর্বত্র চোখে পড়ছিল মৃতদেহের ধূসর ঢিবি।

পথের ওপরে, লেফটেনান্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্নভ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার পঞ্চাশ মিটার খানেক দূরে লেফটেনান্ট কর্ণেলের ড্রাইভার ও দোভাষী — লোকটা আবার একজন লেফটেনান্টও বটে — জার্মান হেড কোয়ার্টারের একটা সাঁজোয়া গাড়ির ডালার ভেতরে কী যেন একটা কাজে ব্যস্ত। আরও চারজন — তারা অবশ্য ঠিক কোন্ পদাধিকারী আমি বুঝতে পারলাম না — রাস্তার ওধারের ট্রেঞ্চগুলোর ভেতরে ঢুকে কী যেন খোঁজাখুঁজি করছিল। লেফটেনান্ট কর্ণেল চেঁচিয়ে কিছু একটা বলছিলেন— কিন্তু কী বলছিলেন হাওয়ার জন্য শুনতে পেলাম না।

আমি এগিয়ে আসতে গ্রিয়াজ্নভ বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত তাঁর রোদে পোড়া মাংসল মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে অনেকটা যেন অবাক হয়ে, অনেকটা বা উল্লসিত হয়ে রুক্ষ ধরনের

কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে গাল্‌ৎসেভ যে! তুমি বে'চে আছ তাহলে?'

'বে'চে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন! যাব কোথায়?' আমি হেসে বললাম। 'আপনার কুশল কামনা করি!'

'বেশ, বেশ, বে'চে যখন আছ তখন তোমারও কুশল কামনা করি।'

উনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে আমি করমর্দন করলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে গ্রিয়াজ্‌নভ ছাড়া আর কেউ আমার কথা শুনতে পাবে না তখন আমি তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম:

'কমরেড লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি — ইভান কি ফিরে এসেছে?'

'ইভান?.. কোন্ ইভান?'

'ঐ যে সেই ছেলেটা, বন্দারেভ।'

'সে ফিরল না ফিরল তোমার তাতে কী?' গ্রিয়াজ্‌নভ অসন্তুষ্টস্বরে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ভুরু কুচকে তাঁর ধূর্ত ধরনের কালো চোখে আমার দিকে তাকালেন।

'হাজার হোক আমি ওকে পার হতে সাহায্য করেছিলাম কিনা, তাই...'

'কে কাকে সাহায্য করেছিল তাতে কী আসে যায়? যে-কোন লোকের জানা দরকার কতটা তার জানা উচিত। এটা হল আর্মির নিয়ম, বিশেষ করে স্কাউটিং-এর কাজে ত বটেই!'

'আমি কিন্তু প্রশ্ন করছি একটা কাজের জন্যেই। অবশ্য আর্মির কাজের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই — ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ... আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম এটা ওকে উপহার দেব...' আমি আমার

ওভারকোটের বোতাম খুলে বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিয়ে লেফটেনান্ট কর্ণেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'আপনার কাছে আমার অনুরোধ, ওকে দিয়ে দেবেন। আপনি যদি জানতেন এটা পাওয়ার কী ইচ্ছেই না ছিল ওর!'

'জানি গাল্‌ৎসেভ, জানি,' ছুরিটা নিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেফটেনান্ট কর্ণেল বললেন। 'মন্দ নয়। তবে এর চেয়েও ভালো ছুরি আমার দেখা আছে। এই ছুরি ওর অন্তত ডজন খানেক আছে — এক বাক্স ভর্তি... কী করা যাবে বল — শখ! বয়সটাই এরকম কিনা। একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে আর কীই বা আশা করা যায়! বেশ, দেখতে পেলে অবশ্যই দেব।'

'তার মানে, আপনি বলছেন... ও ফিরে আসে নি?' আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

'এসেছিল। আবার চলে গেছে — নিজেই চলে গেছে।'

'সে কী ক'রে?'

লেফটেনান্ট কর্ণেল ভ্রূকুটি করে দূরে কোথাও একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চুপ করে রইলেন। তারপর কণ্ঠস্বর নামালেন, ভরাট চাপা গলায় ধীরে ধীরে বললেন: 'ওকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। ও নিজেও রাজি হয়েছিল। সকালবেলায় দরকারী কাগজপত্র তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু রাতের বেলায় চলে যায়। ওকে দোষ দিতে পারি না — ওর মনোভাব আমি বুঝতে পারি। সে অনেক কথা, তাছাড়া তোমার জেনেই বা কী হবে?'

তিনি আমার দিকে বসন্তের দাগে ভরা তাঁর বিশাল মুখটা ফেরালেন — সে মুখে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য, অন্যমনস্ক ভাব। 'ওর ভেতরকার ঘৃণা এখনও জ্বলে পুড়ে শেষ হয় নি। তাই ওর স্বস্তি নেই। ও ফিরে এলেও আসতে পারে, তবে খুব সম্ভবত

গেরিলাদের দলে যোগ দেবে। তুমি ওর কথা ভুলে যাও, ভবিষ্যতের জন্য একটা কথা মনে রাখবে — লাইনের পেছনে আমাদের যারা লোকজন আছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা সমীচীন নয়। ওদের সম্পর্কে কথা যত কম হবে, লোকে যত কম ওদের কথা জানবে ওদের বাঁচার সম্ভাবনা তত বেশি… তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল দৈবাৎ। যদি বলি, ওর সম্পর্কে জানা বা জানতে চাওয়া তোমার উচিত নয়, তাহলে রাগ করবে না কিন্তু! তাই বলি, এর পর মনে রেখো — ওরকম কোন ঘটনাই ঘটে নি, বন্দারেভ বলে কাউকে তুমি জান না, তুমি কিছু দেখ নি, কিছু শোন নি। কাউকে পার হতে সাহায্য কর নি! সুতরাং জিজ্ঞেস করারও কিছু নেই। বুঝলে ত?’

...আমিও তাই আর কোন প্রশ্ন করি নি। তাছাড়া প্রশ্ন করবই বা কাকে? এর কিছুদিন পরেই স্কাউটিং-এর কাজ করতে গিয়ে খলিন মারা গেল। ভোরের আলো ফোটার সামান্য আগে আগে আধা-অন্ধকারের মধ্যে তার স্কাউটদলটি জার্মানদের ফাঁদে গিয়ে পড়ে — মেশিনগানের ছর্‌রায় খলিনের দুটো পা’ই যায়। দলের সকলকে পিছু হটার নির্দেশ দিয়ে সে মাটিতে শুয়ে শুয়ে পালটা গুলি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। তাকে যখন ওরা ধরে ফেলে তখন ও একটা ট্যাঙ্কবিরোধী গ্রেনেড ফাটায়। এদিকে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিয়াজ্‌নভও অন্য আর্মিতে বদলি হয়ে চলে গেলেন — তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আমাকে উপদেশ দিলে কী হবে, ইভানের কথা কিন্তু আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। সেই খুদে স্কাউটটাকে আমার প্রায়ই মনে পড়ত, কিন্তু তাই বলে আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে কখনও তার দেখা পাব কিংবা তার পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানতে পাব।

নয়

কভেলের যুদ্ধে আমি গুরুতর আহত হয়ে 'সীমাবদ্ধ কাজের পর্যায়ভুক্ত' হলাম। আমাকে কেবল যুদ্ধের বাইরে ইউনিট স্টাফের কোন কোন কাজে লাগানোর বা যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হল। আমাকে আমার নিজের ব্যাটেলিয়ন ও ডিভিশন ছাড়তে হল। যুদ্ধের শেষ ছয় মাসে আমি ঐ একই এক নম্বর বেলোরুশিয়া ফ্রন্টে — অবশ্য অন্য আর্মিতে — কোরের গুপ্তচর দপ্তরে দোভাষীর কাজ করি।

বার্লিন অধিকারের যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন জার্মানদের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও কাগজপত্র হস্তগত করার জন্য যে জরুরী দল গঠন করা হয়েছিল, আমাকে এবং আরও দু'জন অফিসারকে সেখানে পাঠানো হয়।

বার্লিন ২ মে বেলা তিনটের সময় আত্মসমর্পণ করে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দলটা শহরের ঠিক মাঝখানে প্রিন্স আলবার্গস্ট্রাসের ওপরকার একটা বিধ্বস্তপ্রায় দালানের মধ্যে কাজ করছিল। মাত্র কিছুদিন আগে ওটা ছিল জার্মান গুপ্ত পুলিশ গেস্টাপোর সদর দপ্তর।

যা ভাবা গিয়েছিল, বেশির ভাগ দলিলপত্রই জার্মানরা ইতিমধ্যে হয় সরিয়ে ফেলেছে নয়ত নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু দালানের চার তলায় — সবচেয়ে ওপরের তলায় — আমাদের লোকেরা দেখতে পেল একটা বিরাট কার্ড-ইনডেক্স আর ফাইলপত্রে ভর্তি কয়েকটা আলমারি অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। টমিগানচালক যে সৈন্যরা দালানে প্রথম ঢোকে তারা উল্লসিত হয়ে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে এই সংবাদটি জানাল।

'কমরেড ক্যাপ্টেন, ওখানে উঠোনে একগাড়ি ভর্তি কাগজপত্র!'

চওড়া কাঁধওয়ালা এক বেঁটেখাটো সৈন্য ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জানাল।

বিশাল উঠোনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে পাথর আর ভাঙা ইটের টুকরো। এই জায়গাটা এককালে গেস্টাপোর ডজন ডজন লরি আর অন্যান্য গাড়ির গ্যারেজ হিশেবে ব্যবহৃত হত। সেগুলোর কয়েকটা এখন বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আমি চারদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম একটা বাঙ্কার, কিছু মৃতদেহ, বোমার আঘাতে কিছু গর্ত। উঠোনের এক কোণে মাইন সন্ধানের যন্ত্র নিয়ে স্যাপাররা কাজ করছে।

গেট থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল গ্যাস জেনারেটর সমেত একটা উঁচু লরি। লরির পেছনের তক্তাটা নামানো — ভেতরে তেরপলের নীচ থেকে উঁকি মারছিল এস. এস.-এর কালো উর্দিপরা এক অফিসারের মৃতদেহ আর প্যাক করে বাঁধা মোটা মোটা ফাইল ও কাগজপত্রের তাড়া।

সৈনিকটি কোনমতে লরির ডালার ভেতরে ঢুকে পড়ে বাঁধা বাণ্ডিলগুলো হিড়হিড় করে লরির কিনারায় টেনে আনল। আমি আমার ছুরি দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে ফেললাম।

কাগজগুলো আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সিক্রেট ফিল্ড পুলিশ এস. এফ. পি.-র দলিলপত্র। ১৯৪৩-১৯৪৪ সালের শীতকালের নথিপত্র। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, এজেণ্টদের রিপোর্ট, তল্লাশির নির্দেশ, সনাক্তকরণের নথি, নানা ধরনের সংবাদ ও গোপন বার্তার কপি। মানুষের বীরত্ব ও কাপুরুষতার বৃত্তান্ত, যাদের গুলি করে মারা হয়েছে তাদের কথা, গণ প্রতিহিংসার কাহিনী, যারা ধরা পড়েছে কিংবা যাদের ধরা যায় নি তাদের উল্লেখ এই সমস্ত কাগজপত্রের মধ্যে আছে। আমার কাছে এই দলিলগুলির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মজির, পেত্রিকভ, রেচিৎসা, পিনস্ক —

আমার চোখের সামনে একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল গোমেল ও পোলিসিয়ে জেলার অতি পরিচিত সব জায়গা যার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল আমাদের ফ্রন্ট লাইন।

ফাইলগুলোর ভেতরে ছিল বেশ কিছু রেজিস্ট্রি কার্ড — গুপ্ত পুলিশ যাদের খুঁজছিল, খুঁজে বার করেছিল কিংবা যাদের ওপর জোর-জুলুম করেছিল তাদের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরতালিকা আকারে সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি। কোন কোন কার্ডের সঙ্গে আবার ফোটোগ্রাফ সাঁটা।

'এগুলো কাদের ছবি?' লরির ভেতরে যে সৈনিকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে ঝুঁকে পড়ে তার বেঁটে মোটা আঙুল ওগুলোর গায়ে ঠেকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাদের ছবি কমরেড ক্যাপ্টেন?'

আমি কোন জবাব না দিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো একটার পর একটা কাগজ উলটে যেতে লাগলাম, চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম একটার পর একটা ফাইলের ওপর। বৃষ্টি যে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে সে দিকে আমার কোন হুঁশ ছিল না।

হ্যাঁ, ঐ দিন, আমাদের বিজয়ের গৌরবময় দিনটিতে বার্লিনে গুঁড়ি গুঁড়ি ঠান্ডা বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশ ছিল মেঘলা। কেবল সন্ধ্যা নাগাদ আকাশের মেঘ কেটে যেতে ধোঁয়া আর কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঁকি মারল।

দশ দিনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের তুমুল নিনাদের পর এখন বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা এখানে সেখানে টমিগানের ছর্‌রার আওয়াজে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। শহরের মাঝখানে লকলক করে জ্বলছে আগুন। উপকণ্ঠে অনেক বাগান থাকায় লাইলাকের উগ্র গন্ধে বাকি আর সব গন্ধ ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু এখানে কেবল পোড়া গন্ধ, ধ্বংসাবশেষের ওপর ছেয়ে আছে কালো ধোঁয়ার আচ্ছাদন।

'সব দালানের ভেতরে নিয়ে যান!' বাণ্ডিলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে অবশেষে সৈনিকটিকে নির্দেশ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি যন্ত্রচালিতের মতো আমার হাতের ফাইলটা খুললাম। খুলে তাকাতেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল — ফর্মের গায়ে সাঁটা ফোটোগ্রাফ থেকে আমার দিকে চোখ মেলে চাইছে ইভান বুস্লভ।

তার গালের উঁচু উঁচু হাড়, বড় বড় দুই চোখের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান দেখেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। দুই চোখের মাঝখানে অতটা ফাঁক আমি আর কারও দেখি নি।

সে গোমড়া মুখে ভ্রূকুটি করে তাকাচ্ছে — যেমন সে তাকাচ্ছিল নীপারের পাড়ে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়। বাঁ গালের উঁচু হাড়ের একটু নীচে কালো জমাট রক্তের দাগ।

ছবির সঙ্গে যে প্রশ্নোত্তরতালিকা ছিল সেটা কিন্তু পূরণ করা হয় নি। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি পাতাটা ওল্টালাম — নীচে পিন দিয়ে গাঁথা ছিল টাইপ করা একটা পৃষ্ঠা — ২ নম্বর জার্মান আর্মির সিক্রেট ফিল্ড পুলিশ প্রধানের বিশেষ রিপোর্টের কপি।

'নং... লুনিনেৎস শহর। ২৬. ১২. ৪৩। গোপনীয়।

'আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের ফিল্ড পুলিশ প্রধান সমীপেষু...

'১৯৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর সাহায্যকারী পুলিশদলের জনৈক ইয়েফিম তিত্কভ রেললাইনের কাছে আমাদের ২৩ নম্বর আর্মি কোরের নিষিদ্ধ এলাকায় ১০-১২ বছর বয়সের একটা রুশী স্কুল বালকের সন্ধান পায়, দু'ঘণ্টা ধরে নজর রাখার পর সে তাকে আটক করে। ছেলেটা বরফের মধ্যে শুয়ে শুয়ে

কালিন্‌কোভিচি-ক্লিনস্ক সেকশনের মধ্যে মিলিটারী ট্রেনের যাতায়াতের ওপর নজর রাখছিল।

'অজ্ঞাত পরিচয় ছেলেটিকে (পরে জানা যায় স্থানীয় অধিবাসিনী মারিয়া সেমিনার কাছে সে 'ইভান' বলে নিজের পরিচয় দেয়) আটক করার সময় সে ক্ষিপ্ত হয়ে বাধা দিতে থাকে, তিত্‌কভের হাত কামড়ে দেয়। কর্পরাল উইন্‌ৎস সময়মতো ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় একমাত্র তারই সাহায্যে ছেলেটিকে ফিল্‌ড পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়...।

'...জানা যায় যে 'ইভান' কয়েক দিন ধরে ২৩ নম্বর কোরের অবস্থানস্থলে ঘোরাঘুরি করছিল... ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল... রাত কাটাত সে পরিত্যক্ত মাড়াইয়ের জায়গায় কিংবা কোন চালাঘরে। তার পায়ের আঙুল আর হাত তুষারে খেয়ে গেছে, আংশিকভাবে গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয়েছে...।

'তল্লাশের পর 'ইভানের' কাছে... তার পকেটে পাওয়া যায় একটা রুমাল আর অধিকৃত এলাকায় প্রচলিত ১১০ (একশ' দশ) জার্মান মার্ক। এমন কোন বস্তুগত সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে নি যা থেকে গেরিলাদের দলভুক্তি অথবা গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে...। লক্ষণীয় চিহ্ন: পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় শিরদাঁড়া বরাবর একটা বড় জড়ুল, ডান দিকের কাঁধের ফলার ওপরে গুলিতে ছড়ে যাওয়ার ফলে জখমের দাগ...।

'চার দিন চার রাত ধরে মেজর ফন বিসিং, ওবের লেফটেনান্ট ক্লাম্‌ট ও সার্জেন্ট মেজর স্ট্যামার সমস্ত রকম কঠোরতা অবলম্বন করে সযত্নে 'ইভানকে' জেরা করেন। তা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয় নি যাতে তার ব্যক্তিপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা যায় বা নিষিদ্ধ এলাকায় ২৩ নম্বর আর্মি কোরের লাইনে তার অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়।

'জেরার সময় সে উদ্ধত আচরণের পরিচয় দেয় — জার্মান আর্মি ও জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতি তার বিদ্বেষ গোপনের কোন চেষ্টা দেখা যায় না।

'সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক ১৯৪২ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে প্রচারিত আদেশক্রমে ২৫·১২·৪৩ তারিখে ভোর ৬·৫৫ মিনিটের সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

'...তিত্‌কভকে ১০০ (একশ') মার্ক পারিতোষিক প্রদান করা হয়। রসিদ সংলগ্ন আছে...।'

অক্টোবর-ডিসেম্বর
১৯৫৭ সাল

লেখক ভ্লাদিমির বগমোলভের সৃজনী প্রতিভার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ও মৌলিকতা আছে যার ফলে তাঁর লেখা ছোট উপন্যাস ও গল্পগুলি পাঠক ও সমালোচকদের মনে যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিশেবে ছাপ রেখে যায়। এমনকি তাঁর প্রথম উপাখ্যান 'নাম ছিল তার ইভান'-এও তাঁর শিল্পজ্ঞান এত দূর পরিণত হয়ে প্রকাশ পায় যে সমালোচকরা সকলে একবাক্যে তাঁকে পরিণত লেখক বলে স্বীকৃতি দান করেন। নাৎসী অমানুষিকতা শিশুদের মধ্যে যে অস্বাভাবিক ঘৃণার সঞ্চার করেছিল, তাদের ছিন্নমূল জীবনে যে ট্র্যাজিডির সূচনা করেছিল বগমোলভের গল্পগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহসী, কঠোর প্রকৃতির লোকেরা যে ইভানকে ভালোবাসে, মায়া-মমতা করে তার কারণ এই নয় যে সে তার মা-বাবা আর বোনকে হারিয়েছে — কারণ এই যে পদে পদে জীবন বিপন্ন করে সে যা করছে বহু বয়স্ক লোকের পক্ষেও তা করা সম্ভব নয়।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

ইউরি দ্মিত্রিয়েভ। ওরাও কথা বলে

লেখক জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে শিশুদের কাছে জীবজন্তুর 'ভাষা' চর্চার বিবরণ দিয়েছেন। যে-সমস্ত কীটপতঙ্গ খেতের ফসল নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অথবা বিপদগ্রস্ত পশুপাখি ও মাছকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই সব জ্ঞান মানুষ কী ভাবে কাজে লাগায় তিনি তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

প্রকৃতি ও জীবজন্তুকে ভালোবাসা এবং তাদের রক্ষা করা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর কথায়: 'আমাদের চমৎকার পশুপাখিদের অস্তিত্ব নষ্ট হওয়া মানে জীবন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ।'

'রাদ্‌গা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

গাব্রিইল ত্রোয়েপোল্‌স্কি। ধলা কুকুর শামলা কান: উপাখ্যান

গাব্রিইল ত্রোয়েপেল্‌স্কির (১৯০৫) বয়স যখন ৬৭ বছর সেই সময় 'নাশ সভ্রেমেন্নিক' (আমাদের সমকালীন) সাময়িক পত্রে তাঁর 'ধলা কুকুর শামলা কান' উপাখ্যানটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রচনাটি লেখককে বিশ্বখ্যাতি এনে দিল।

এই বইয়ে তিনি কি কোন কুকুরের গল্প বলেছেন? না, তা নয়। আসলে তিনি ভালো ও মন্দের, শুভ ও অশুভের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

সুস্থ বিচারবুদ্ধির সৌন্দর্য, উদারতা ও মহত্ত্বের আকর্ষণশক্তি যে কতটা হতে পারে তা তুলে ধরতে পারা একটি মহৎ কর্ম। লোকের যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় এমন একটা আদর্শজগৎ গড়ে তুলতে গেলে হৃদয়ের যাবতীয় সম্পদ, নিজের সমস্ত বিশ্বাস ও বেদনাবোধ, সৃজনের সমগ্র বহ্নিশিখার পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটাতে হয়। 'ধলা কুকুর শামলা কান' উপাখ্যানে ত্রোয়েপোল্‌স্কি এটা সম্ভব করে তুলেছেন।

তুর্গেনেভের 'মুমু', চেখভের 'কাশ্‌তান্‌কা' ও তল্‌স্তোয়ের 'পক্ষিরাজ' (একটি ঘোড়ার গল্প)-এর মতো ত্রোয়েপোল্‌স্কির 'বিম্‌'ও আমাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। লেখক আমাদের শুনিয়েছেন কল্যাণের সহজ সরল বাণী।

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হবে

মিখাইল ইলিন ও ইয়েলেনা সেগাল। মানুষ কি করে বড়ো হল

দুনিয়ার সমস্ত ছেলেমেয়ে যে 'এক লক্ষ কেন'র উত্তর চায় একটা অন্তত অংশত জোগাবার দুরূহ ও সাধু প্রয়াসে মিখাইল ইলিন (১৮৮৫—১৯৫৩) তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন নিবেদন করেছেন। এ বইটি লেখা হল তাঁর স্ত্রী ও সাহিত্যকর্মী সহযোগী ইয়েলেনা সেগালের সহায়তায়। সুন্দর ভাষায় বইটিতে ছোটদের জন্য বলা হয়েছে মানুষের উদ্ভবের কথা, কেমন করে সে বশ করল আগুন আর লোহা, প্রকৃতিকে চিনে ক্ষমতাধীন করল তাকে, গড়ে তুলল নতুন পৃথিবী। বিশ্বের বহু ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে, এবার আত্মপ্রকাশ করছে নতুন ধরনের মৌলিক অঙ্গসজ্জায়, অজস্র চিত্রে শোভিত হয়ে।